বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

কমলবাসিনীর স্মরণে

বাতায়নে

রাস্তার ধারেই পড়বার ঘর। সেই ঘরের রাস্তার দিকের দুটো জানালা খুলে আমরা দুই ভাই বসে আছি—পথের দিকে চোখ ও মন খুলে। একটু আগেই শিশি-বোতল-বিক্রিওয়ালার কাছে এক সের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা দু-আনায় বেচে ছ-পয়সায় ছ-টা কালো-জাম কিনে এক-এক জন তিনটে ক'রে খেয়ে দেহ ও মন পরিতৃপ্ত। এ কালো-জাম গাছে ফলে না, ফলে ময়রার দোকানে—এক রকম ছানার পান্তুয়া-গোছের জিনিষ। পান্তুয়াকে একটু বেশী ভেজে ওপরটা কালো ক'রে রসে চোবানো হয়—আজকাল সে দ্রব্যটির আর দেখা পাওয়া যায় না।

বাকি দু-টো পয়সা হাতে নিয়ে বসে আছি—লজঞ্চুসওয়ালাকে দিতে হবে, তার কাছে ধার ক'রে লজঞ্চুস খাওয়া হয়েছে। ধারের কথা জানতে পারলে বাড়ীতে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

রাস্তার ধারে বসে আছি—গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম চুকে গেছে। মা-রা সব ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। দুপুর বেলা একটু শব্দ কোথাও হবার জো নেই—রাতে ঘুম হোক্‌ বা না হোক, দিনে ঘুমের ব্যাঘাত হ'লে অনর্থ হবে। আমাদের চলা-ফেরা, অকার্য ও কার্যালাপে একটু শব্দ হ'লেই তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় অথচ পার্শ্বে শায়িত শিশুর চীৎকারে পাড়ার লোক বিরক্ত হ'য়ে গাল পাড়তে থাকে তবুও তাঁদের নিদ্রা ভাঙে না।

আমাদের অপরাধে ঘুম ছুটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন—গর্মির ছুটির জন্য। বোধ হয় তার ফলেই ইস্কুল-মাষ্টারদের দুঃখ-দুর্দশা আজও ঘুচলো না।

রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি দুই ভাইয়ে—ঐ অনাথের মা বুড়ী স্নান ক'রে ভিজে-কাপড়ে চলে যাচ্ছে। অনাথের মাকে পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে। এ-পাড়ায় প্রায় সব বাড়ীতেই সে কাজ করেছে, প্রায় পঞ্চাশ বছর এ-পাড়াতেই তার কাটল। কোমর ভেঙে গিয়েছে তবুও আজও তাকে খেটে খেতে হচ্ছে। তার বাড়ী সেই গড়পারের কোন বস্তীর মধ্যে। এখন গিয়ে সে রান্না-বান্না ক'রে খাবে, তার পরে আবার বেলা চারটে বাজতে না বাজতে কাজে এসে লাগতে হবে। আবার রাত্রি আটটা-নটায় বাড়ীতে গিয়ে রান্না ক'রে খেয়ে-দেয়ে শোবে। অনাথের মা বলে সবাই তাকে ডাকে বটে, কিন্তু অনাথ তার ছেলে নয়—তার এক বোন-পোকে সে মানুষ করেছিল, তার নাম ছিল অনাথ। সে-ও মরে গেছে শৈশবে, পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু আজও লোকে তাকে অনাথের মা বলে ডাকে।

অনাথের মা কিছুদিন আমাদের বাড়ীতেও কাজ করেছিল, কিন্তু কাজের ঠেলায় পালাতে পথ পায়নি। সে সময়ে অনাথের অনেক গল্প সে আমাদের কাছে বল্‌ত। কেমন সুন্দর দেখতে ছিল সে, সে তাকে মা বলে ডাক্‌ত—সেই ডাক এখনো তার কানে লেগে রয়েছে। এক দিন রাতে তার জ্বর হয়েছিল—রাত দুপুরে অনাথ তার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—মা, তোর জ্বর হয়েছে।

অনাথ সম্বন্ধে এই গল্পটি অনেকবার সে আমাদের কাছে করেছে আর প্রতিবারেই তার চক্ষু সজল হয়েছে, গলা ধরে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে মরে-যাওয়া অচেনা অনাথের দুঃখে আমাদেরও কণ্ঠরোধ হয়েছে, আমাদের গল্পের আসর ভেঙে গিয়েছে।

অনাথের মা চলে গেল। বসে আছি লজঞ্জুসওয়ালার আশায়। দু-পয়সা শোধ দিয়ে আবার দু-পয়সার লজঞ্জুস খাব—ঐ যায় রিপুকর্ম্মওয়ালা—রোগা, একেবারে হাড়গোড় বার করা, নুয়ে পড়া।

স্বরে গেঁঙিয়ে-গেঁঙিয়ে চলে যায় রি-পু-কম-মণ্ড, দূর থেকে শুনতে লাগে যেন—কি-কু-ম্‌-মণ্ড।

দূরে গলির মোড়ে লজঞ্চুসওয়ালার পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল —ল্যাওনচুস্‌—ল্যাঞ্চুস—

তড়াক্‌ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে রকে দাঁড়ান গেল। লজঞ্চুসওয়ালা কাছে আসতেই ইসারায় তাকে ডেকে আমরা ভেতরে ঢুকে গেলুম। আমাদের দ্বিপ্রাহরিক গৃহবিধির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সে বাড়ীর সামনে এসে হাঁক-ডাক থামিয়ে কিছুক্ষণ এদিক্‌-ওদিক্‌ দেখে টপ্‌ ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকত, আমরা দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতুম। এত সাবধানতার কারণ এই যে, কোনো রকম শব্দ হোলে ওপরওয়ালাদের ঘুম ভেঙে যাবে—যার ফলে আমাদের নানান অসুবিধা, এমন কি বিপদ-আপদ ঘটবার সম্ভাবনাও ছিল। ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে দেনা-পাওনার কথা হোতো, তার পরে লজঞ্চুস খেতে-খেতে গল্প চল্‌ত। বলা বাহুল্য, এক ভাগ লজঞ্চুস তারও প্রাপ্য ছিল। সব দিনই তাকে ভেতরে আনবার সুবিধা হোতো না, মধ্যে-মধ্যে রাস্তা থেকেই তাকে বিদেয় দিতে হোতো।

এই লজঞ্চুসওয়ালা ছিল আমাদের বন্ধু। আমাদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবধান ছিল বটে, কিন্তু এই মিলনের দৌত্য করেছিল আমাদের কৈশোর আর তার দিকে ছিল প্রাণৈশ্বর্য।

সে ছিল মুসলমান। বিহারের কোন এক জেলায় তাদের বাড়ী ছিল, কিন্তু দেশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই—অনেক দিন থেকে তারা ব্যারাকপুরে বাস করছে। তার আপনার জন বলতে কেউ নেই। তার বড় বোনের স্বামী ব্যারাকপুরের কাছে কোন এক কলে কুলীগিরি করে, সেই সূত্রেই ওখানে বাস! বড় বোনও বেঁচে নেই, ভগিনীপতি আবার বিয়ে করেছে, এ বৌয়ের ছেলেপুলেও হয়েছে। ঐখানেই সে থাকে,

কারণ, তাদের ওপরে মায়া পড়ে গিয়েছে, ছাড়তে পারে না। বছরের মধ্যে কয়েক মাস সে-ও কলে কাজ করে। বাকী কয়েক মাস লজঞ্চুস বিক্রি করে কলকাতায়। রোজ বেলা নটা-দশটার সময়ে ট্রেণ চড়ে আসে এখানে, আর রাতের ট্রেণে ফিরে যায়। রামবাগানে কোথায় দিশি লজঞ্চুসের কারখানা কাছে, সেখান থেকে পাইকারী দরে মাল খরিদ করে।

তার নাম ছিল মুখিয়া। মুখিয়া মানে সর্দার। কিন্তু কোনো দেশের মনুষ্য জাতি অথবা সম্প্রদায়ের সর্দার হবার মতন গুণ বা চেহারা তার ছিল না। অবিশ্যি এ জন্য তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না! মানুষের নাম অতি অল্প ক্ষেত্রেই গুণবাচক হ'য়ে থাকে। দেখা যায় বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে নামের গুণাবলীর সঙ্গে মানুষের অহি-নকুল সম্পর্ক দাঁড়াতে থাকে। নামকরণ সংস্কারটি মানুষের মৃত্যুর পরই হওয়া উচিত।

আমরা তখন বালক হ'লেও মুখিয়ার চাইতে মাথায় উঁচু ছিলুম। বামনের মতন মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের বড় হ'লেও তাকে ঠিক বামন বলা চলত না। তার রং ছিল কালো। কিন্তু বাপ রে, সে কি কালো! ডান দিকের মাথার মাঝখান থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে চিবুক অবধি পোড়া। এতখানি জায়গা একেবারে মসৃণ ও চকচকে এবং তার মাঝে মাঝে সাদা দাগ, ধবলের মতন—অমাবস্যার অন্ধকার আকাশে যেন তারা ঝক্ ঝক্ করছে। পুড়ে যাওয়ার ফলে ডান চোখের কোণটা যেন টেনে ধরা হয়েছে গোছের, আর চোখের তলার দিকের লাল্‌টা বেরিয়ে এসেছে —যেন দগ্‌দগে ঘা। ডান দিকে মাথায় চুল, ভুরু, গোঁফ কিংবা দাড়ি এক গাছিও নেই। বাঁ দিকের মাথায় চুল এবং ভুরু আছে বটে, কিন্তু দাড়ি এখানে দুটি ওখানে চারটি—গোঁফও সেই রকম। এক দিক্‌কার দাড়ি-গোঁফ চেঁচে ফেলে তাকে ভদ্র হ'তে বললেই সে তার সেই কয়েক গাছা দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বলত—ওরে বাবা, তা হয় না—আমি

নেমাজী লোক, দাড়ি ফেলতে পারি কখনো? বয়স ছিল তার ত্রিশের ওপর। একবার কল্পনা করুন সেই চেহারাখানা!

কিন্তু সেই কুৎসিতের মধ্যে বাস করত একটি সুন্দর প্রাণ।

মুখিয়া মাসে প্রায় পনেরো-যোলো টাকা রোজগার করত, কিন্তু তা থেকে নিজের সম্ভোগের জন্য একটি পয়সাও খরচ করত না, সব ভগিনী-পতির হাতে তুলে দিত। সে বলত—ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে বড় ভালবাসি, তাই তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারি না। নইলে এত বড় দুনিয়ায় কি থাকবার জায়গার অভাব আছে?

অথচ তারা তার নিজের বোনের ছেলেপিলে নয়। তার ভগিনীপতির দ্বিতীয়া স্ত্রীও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। সে মুখিয়াকে 'পোড়ারমুখো' বলে ডাকৃত।

আমরা বলতুম—তুই কিছু বলতে পারিস্ না?

মুখিয়া বলত—কি আর বলব! সত্যিই তো আমার মুখ পোড়া।

এই সবের জন্য তাকে আমাদের বড় ভাল লাগত ও পরে সেই আকর্ষণ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

তার সঙ্গে কেমন ক'রে বিচ্ছেদ হোলো সেই কাহিনীটাই বলি।

আমাদের সেই দ্বিপ্রাহরিক আড্ডাটা সেবার গরমের ছুটির সময় খুবই জমে উঠেছিল। মুখিয়া ছাড়াও লজঞ্চুসের লোভে-লোভে পাড়ার আরও দুটি-তিনটি ছেলে এসে রোজ জমতে লাগল সেখানে। বাড়ীর কেউ জানে না, খুবই সন্তর্পণে আড্ডাধারীরা যাওয়া-আসা করে। আমরা দুই ভাই বাড়ীর মধ্যে উচ্চহাসির জন্য কুখ্যাত ছিলুম, কিন্তু আড্ডা ধরা পড়বার ভয়ে সে সময়টা আমরা প্রাণপণে হাসি সামলে রাখতুম। একটি ছেলে ছিল, সে ভারি মজার-মজার সব গল্প ও কাহিনী বলতে পারত। সেই বয়সেই গল্প বলবার বেশ একটা চাল সে আয়ত্ত করেছিল।

মাঝে-মাঝে তার গল্প শুনে হাসি সামলাতে না পেরে আমরা মুখে কাপড় ঠেসে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে প্রাণ খুলে হেসে আসতুম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সে নিজে একটুও হাসত না বরং আমাদের মুখের দিকে এমন জিজ্ঞাসু ভাবে চাইত যে মনে হোতো সে বলতে চায়—কি রে হাস্‌চিস কেন—এতে হাসবার কি আছে রে?

মুখিয়া ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানত বটে, কিন্তু সব কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সে সব সময়ে ধরতে পারত না—আমাদের হাসতে দেখে সে হাসবার চেষ্টা করত মাত্র।

সেদিন সেই ছেলেটি একটা মজার গল্প বেশ জমিয়ে বলছিল, এমন সময় গল্পের মাঝখানেই হঠাৎ মুখিয়া তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—ঠিক বাচ্চা গাধার মতন।

হঠাৎ তার সেই চীৎকার শুনে আমরা তো ভড়কেই গেলুম কিন্তু একটু পরেই টের পাওয়া গেল যে সেটা তার হাসি।

হাসি আর থামে না। আমরা যত বলি, এই মুখিয়া, চুপ কর—চুপ কর ভাই, মা উঠে পড়বেন—

আর চুপ কর! একটা দম-দেওয়া কলের মতন মুখিয়া সেই ভাবে গাধার ডাক ছেড়ে চল্‌ল। হাসির সময় তার মুখের চেহারা হ'য়ে উঠল একেবারে বীভৎস। তার মুখের সেই পোড়া দিক্‌টা কি রকম কুঁকড়ে গিয়ে বেরিয়ে-পড়া চোখটা যেন আরও ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কিছুতেই তাকে থামাতে পারি না। ওদিকে মার ঘরের দরজা খুল্‌ল, তাকে তাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু কে কার কথা শোনে! হাসির ধমকে সে-সব কথা সে বুঝতেই পারলে না। ইতিমধ্যে মা এসে আমাদের দরজা খুলে দাঁড়াতেই মুখিয়ার হাসি গেল থেমে। হাসি থাম্‌ল বটে কিন্তু তার মুখখানার অবস্থা সেই রকমই বেঁকে-চুরে তুব্‌ড়ে রইল।

মা বোধ হয় প্রথমে মুখিয়াকে দেখতে পাননি। ঘরে ঢুকে সেদিকে চোখ পড়তেই তাকে দেখে চম্‌কে—এটা কে রে! বলে এক পা পিছিয়ে গেলেন।

মুখিয়া ততক্ষণে তার লজঞ্চুসের ডালাটা সামলে নিয়ে মাকে ছোট্ট একটা সেলাম ক'রে সরে পড়ল—তার পেছনে-পেছনে পাড়ার অন্ত দুটি ছেলেও সরে পড়ল। হাঙ্গামার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরাও তখনকার মতন চিলের-ছাতে উঠে আত্মগোপন করলুম।

বাবা আপিস থেকে ফেরবার পর বিকেলে একটা খোলা বারান্দায় মাহুর পেতে রোজই আমাদের এক পারিবারিক বৈঠক বস্‌ত। বাড়ীতে কয়েকজন মহিলা থাকতেন, তাঁরা আমাদের সংসারেরই লোক হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখের ওপরে চোপরা, অথবা প্রকাশ্যে তাঁদের সম্বন্ধে কোনো রকম অসম্মানকর মন্তব্য করলে আমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হোতো। প্রাত্যহিক এই পারিবারিক সভায় তাঁরাও উপস্থিত থাকতেন। এইখানে প্রতিদিনই—বাবা আপিসে চলে যাবার পর এতক্ষণ পর্যন্ত—অর্থাৎ যতক্ষণ আমরা তাঁর চোখের আড়ালে ছিলুম—আমরা কি করেছি, অর্থাৎ কেমন ভাবে দিন কাটিয়েছি, তার একটা ফিরিস্তি পেশ করতে হোতো। বলা বাহুল্য, রোজই বলতুম, এগারোটা থেকে চারটে অবধি লেখাপড়া করেছি—প্রমাণ-স্বরূপ, হাতের লেখা, অঙ্ক কষা প্রভৃতি তিনি রোজই নিয়ম মত দেখে তাতে সই ক'রে দিতেন।

সেদিন আসরে ডাকের ধরণ দেখেই বুঝতে পারলুম, আজ বরাতে কিছু দক্ষিণা আছে।

আসরে উপস্থিত হতেই বাবা গম্ভীরস্বরে বললেন—বোসো।

একটু নিরাপদ ব্যবধানেই গুটি-সুটি হয়ে বসে পড়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই সনাতন প্রশ্ন—আজ দুপুরে কি কি করলে?

যদিও জানতুম যে, আজ দুপুরের কাহিনী বেশ পল্লবিত হ'য়েই তার কানে পৌঁছেচে তবুও বুক ঠুকে সেই সনাতন উত্তরই দিয়ে বললুম—এগারোটা থেকে পৌনে বারটা অবধি অঙ্ক কষেছি, পৌনে বারোটা থেকে পৌনে একটা অবধি ভূগোল পড়েছি, পৌনে একটা থেকে একটা অবধি ম্যাপ দেখেছি—

আর বেশী অগ্রসর হবার আগেই একটি মহিলা বলে উঠলেন—ম্যাপ দেখেছ না ছাই দেখেছ!

তারপরে বাবার দিকে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—সারাদিন খালি হুল্লোড়, হাসি, আড্ডা, গল্প এই তো চলে দেখছি, পড়ে কখন তা তো জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন সুরু করলেন—দুপুর বেলা ওদের অত্যাচারে চোখের পাতাটি বোজবার যো আছে! হৈ হৈ চলেইছে!

আর এক জন মন্তব্য করলেন—এই বয়সে এত বন্ধুই বা এদের জোটে কি ক'রে তাই ভাবি। রাজ্যের লোকের সঙ্গে গলাগলি!

এবারে মা বললেন—আর সে সব বন্ধুর চেহারাই বা কি!

বাবা বললেন—সারা দিন হি হি হি হি আর হো হো হো হো ক'রে ক'রে নিজেদের যে রকম চেহারা হয়েছে, বন্ধু-বান্ধবও তো জুটবে সেই মেক্‌দারের—

যা হোক্‌, সেদিনকার সভায় ঠিক হ'য়ে গেল হে দুপুর বেলা আমাদের সায়েস্তা রাখবার এক জন জবরদস্ত শিক্ষক রাখা হবে, আর সকাল-সন্ধ্যের জন্য বাবা তো আছেনই। তাঁর সন্ধানে এমন লোক আছে এ-কথা তিনি সভাক্ষেত্রে প্রকাশ করলেন।

পরের দিন দুপুর বেলায় আড্ডায় দুঃসংবাদটি প্রকাশ করা গেল।

মুখিয়াকে বললুম—বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দু-বার 'ল্যাবেঞ্চুস্‌' বলে হাঁক দিলেই আমরা বেরিয়ে আসব।

দিন দুই বাদে আমরা দুপুরের মাষ্টার মশাইকে দেখলুম। আফিস থেকে ফেরবার সময় বাবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন; বেশ চেহারা ও দিব্যি ভদ্র অমায়িক ভাব। আমাদের দুই ভাইয়ের গাল টিপে-টিপে আদর ক'রে বললেন—এরা তো বেশ ছেলে! আপনি যে রকম বললেন দেখে তো তা মনে হয় না।

বাবা একটু হেসে বললেন—এক একটি বর্ণচোরা। দু-দিনেই পরিচয় পাবেন।

ঠিক হ'য়ে গেল কাল দুপুর থেকেই তিনি আমাদের গুরুভার গ্রহণ করবেন।

সেদিন রাত্রিবেলা আমাদের পড়াতে-পড়াতে বাবা বললেন—আমি মাষ্টার মশাইকে বলে দিয়েছি, তোমাদের মেরে ফেললেও আমি তাঁকে কিছু বলব না, অতএব সাবধান হয়ে চোলো।

প্রাণধারণের উপকরণগুলির দুর্মূল্যতার সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ জিনিষটি আজকাল যে রকম সুলভ হ'য়ে উঠেছে সে যুগে তা ছিল না, কাজেই অত্মরক্ষার তাগাদায় সাবধান হবারই সংকল্প করতে লাগলুম মনে-মনে।

ছুটির সময় দুপুর বেলা এই রকম সাজার ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবার ওপরে হাড়ে চটে গেলুম; আমরা যে রকম সন্তর্পণে কথা বলতুম, চলতুম এবং যে রকম সাবধানতার সঙ্গে দরজা খোলা ও বন্ধ করা হোতো তাতে কারুরই কখনো ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া উচিত নয়। অবশ্যি এক দিন মুখিয়া তার অদ্ভুত হাসি হেসে সবাইকে চমকে দিয়েছিল স্বীকার করি। অদ্ভুত রসে চমক লেগেই থাকে—সেটা তাঁরা সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একবাক্যে রায় দিলেন যে, দুপুর বেলা আমাদের অত্যাচারে কোনো দিনই তাঁরা ঘুমুতে পারেন না!

কি ক'রে তাঁদের সেই আরামের দ্বিপ্রাহরিক সুখস্বপ্নটির ব্যাঘাত জন্মাতে পারা যায়, তারই পরামর্শ আঁটতে লাগলুম দুই ভাইয়ে।

পরের দিন দুপুর বেলা এগারোটা বাজতে না বাজতে মাষ্টার মশায় এসে হাজির হলেন। এগারোটা থেকে চারটে অবধি কবে কখন কি পড়া বা লেখা হবে প্রথমেই তার একটা রুটিন তৈরী হোলো, তার পরে আসল পড়া সুরু হোলো।

পড়তে লাগলুম মনে মনে। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে মাষ্টার মশায় বললেন—চেঁচিয়ে পড়, তা না হোলে আমি বুঝব কি ক'রে যে তোমরা পড়ছ না ফাঁকি দিচ্ছ। চেঁচিয়ে পড়ার আর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, যা পড়বে সঙ্গে-সঙ্গে মুখস্থ হয়ে যাবে।

ব্যস্! আর বলতে হোলো না, সঙ্গে-সঙ্গে হদিশ লেগে গেল। সেই থেকে সুরু ক'রে বেলা চারটে অবধি আমরা এমন চেঁচিয়ে পড়লুম যে বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুম তো দূরের কথা, ডাকাত পড়েছে মনে ক'রে কুকুর-গুলো পর্যন্ত ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওপর-নীচ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

যথাসময় মাষ্টার মশায় চলে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারা গেল যে, আমাদের পড়া মুখস্থ করার আগ্রহটা তিনি ভালো ভাবে গ্রহণ করেন-নি।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখলুম, সবারই মুখ বেশ গম্ভীর—বুঝলুম ওষুধ লেগেছে।

দিন কতক এই রকম চলল—কিন্তু কাঁহাতক রোজ পাঁচ ঘণ্টা ক'রে চেঁচানো যায়, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পেটে ও কোঁকে ব্যথা ধরে গেল। তার ওপরে, দিনে ঘুমোনো যাদের অভ্যেস, তারা ইঞ্জিন তৈরির কারখানায় পড়েও দিব্যি ঘুম লাগাতে পারে, দু-এক দিন একটু কষ্ট হয় মাত্র।

বাড়ীতে দিন কয়েক মিস্ত্রি খেটেছিল। উদ্বৃত্ত বিলিতী-মাটি, বালি, চূণ ইত্যাদি বাড়ীর এক জায়গায় যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছিল

ভবিষ্যতের জন্য। এর কাছেই মিস্ত্রিদের ছোট-বড় কর্ণিক ইত্যাদি সব জড় করা ছিল। মিস্ত্রিদের কাজ ও সরঞ্জাম দেখতে-দেখতে আমাদের স্থপতি-প্রতিভা মাথা-চাড়া দিলেন—ঠিক করা গেল, একটি ছোট বাড়ী তৈরি করতে হবে।

ক'দিন ধরে ছোট-বড় দেশলাইয়ের মধ্যে এঁটেল মাটি পুরে সেগুলোকে রোদে শুকিয়ে একরাশ ইট ও টালি তৈরি করা হোলো। এক দিন রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের এক কোণে মেজে খুঁড়ে বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করা গেল। সকাল বেলা বাড়ীর চারিদিকে লোক-জন চলাফেরা ইত্যাদি নানা ব্যাঘাতে কাজ তেমন অগ্রসর হোলো না। ঠিক হোলো, তুপুর বেলা পড়বার সময় এক-একবার এক এক জন ক'রে উঠে এসে কাজ করা যাবে।

যথা সময়ে মাষ্টার মশায় এলেন। ওপরওয়ালীরা সব শয়নমন্দিরে প্রবেশ করবার পর আমি উঠে গিয়ে আধ-ঘণ্টাটাক কাজ ক'রে ফিরে এলুম। ভায়া উঠে গেল তার পর, সে ফিরল প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে। এই রকম ক'রে তুজনে বার তু-তিন গিয়ে কাজ করা গেল। মনে হোলো এই রেটে কাজ চালাতে পারলে পরের দিনেই একতলার কাজটা শেষ হ'য়ে যেতে পারে।

কিন্তু হায় রে পরের দিন! সেদিনটায় তিথি-নক্ষত্রের যে কি সমাবেশ ছিল তা আজও ভাবি।

সেদিন মাষ্টার মশায় এসে বসতে না বসতে আমি উঠে গেলুম, কারণ সিমেণ্টটা মাখা হয়েছিল, দেরী হোলে আবার শুকিয়ে যাবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে ফিরে এলুম—অর্থাৎ মাষ্টার মশায় যেন মনে করেন বই খুঁজতে দেরী হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ বসতে না বসতে ভায়া উঠে গেল ও প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসে গুটি-গুটি নিজের জায়গায় বসতে যাচ্ছে, এমন সময় মাষ্টার মশায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ইংরেজীতে—You boy. come here.

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমরা ভড়কে গেলুম। মাষ্টার মশায় আমাকেও ডাক ছাড়লেন ইংরেজীতে, ঐ সুরেই।

আমরা দু-জনে তাঁর কাছে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালুম। তিনি বললেন—কাল থেকে দেখছি পড়তে-পড়তে উঠে যাচ্ছ—কোথায় যাও—এঁ্যা—

এই বলে, আমাদের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রেই দু-জনের মাথায় টাঁই-টাঁই ক'রে কয়েকটি শ্রীগাঁট্টা জমিয়ে দিলেন।

উঃ, মাথা একেবারে চিড়্‌বিড়িয়ে গেল। যে কখনো মারে না তার হাতের আঘাতে লাগে বেশী, কারণ দেহ ও দেহাতীত দু-জায়গাতে লাগে সে আঘাত।

যা হোক, মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে তো নিজের জায়গায় এসে বসলুম। মাষ্টাব মশায়ের রাগ তখনো পড়েনি। তিনি গর্জে-গর্জে বলতে লাগলেন—চারটের আগে এখান থেকে এক-পা নড়েছ কি দেখবে মজা!

ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা সামনে খোলা পড়েছিল। মাথার যন্ত্রণায় মনে হ'তে লাগল সমস্ত ভারতবর্ষের বুক জুড়ে সর্ষের ক্ষেত ভরে উঠেছে।

মাষ্টার মশায় আবার গর্জে উঠলেন—তোমাদের বাবা যে তোমাদের 'বর্ণচোরা' নাম দিয়েছেন তা ঠিকই দিয়েছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি।

নামকরণ করার ব্যাপারে বাবার প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদেরও কোনো সন্দেহ ছিল না, কারণ আমাদের নামের জোড়া সেদিন জগতে দুর্লভ ছিল, আজও সুলভ নয়। তাই সেদিক্ দিয়ে না গিয়ে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীর অনেক লোকই বর্ণচোরা—যেমন আপনি একটি।

নানা রকম আবোল-তাবোল চিন্তা পাক খাচ্ছে মগজের মধ্যে, এমন সময় গলির মোড়ে আওয়াজ হোলো—ল্যা—বেন – চুওওস্—

মুখিয়ার কাছে এক পয়সা দু-পয়সা ক'রে সেবার প্রায় চার আনা ধার হ'য়ে গিয়েছিল। ক'দিন থেকে পয়সার জন্য তাগাদা করায় সেদিন তাকে নিশ্চয় দিয়ে দেবার কথা ছিল—পয়সার জোগাড়ও হ'য়ে গিয়েছিল,

কিন্তু কি ক'রে উঠে গিয়ে তাকে পয়সা দেওয়া যায়! ওদিকে মুখিয়া হাঁকতে-হাঁকতে বাড়ীর সামনে এসে সাঙ্কেতিক ডাক ছাড়লে —ল্যাওনচোস্!

আমাদের ভাবান্তর দেখে মাষ্টার মশায়ের সজাগ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে উঠল। ওদিকে মুখিয়া আরও দু-তিনবার অতি বিনীতভাবে ল্যাবেন-চোস্—ল্যাওনচোস্ বলে হঠাৎ বীরদর্পে চোওওস্ বলে এমন একটা হাঁক ছাড়লে যে, দেশকালপাত্র ভুলে আমরা দু-জনেই হেসে ফেল্লুম।

আমাদের হাসতে দেখে মাষ্টার মশায় রেগে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—হাস্‌ছ কেন?

ঠিক সেই মুখে ছুঁচোবাজীর চালে মুখিয়া আর এক হাঁক ছাড়লে—চোঁই ওঁই ওঁই ওঁই ও ও ওস্।

ব্যস্, আর যায় কোথায়! হাসি চাপা আর সম্ভব হোলো না, এবার আমরা জোরে হেসে উঠলুম।

আমাদের ধৃষ্টতা দেখে মাষ্টার মশায় বললেন—আচ্ছা, তোমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ছি।

বলার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনের ওপর এলোধাপাড়ি কীল, চড়, গাঁট্টা পড়তে লাগল। আমাদেরও কি রকম রোখ চেপে গেল—মাষ্টার মশায় যতই মারুন না কেন কিছুতেই হাসি থামাব না।

ওদিকে সেদিন যেন মুখিয়ার প্রতিভা খুলে গেল। সে অদ্ভুত রকমারী বাঁট-কর্ত্তবে 'ল্যাবেঞ্চুস্' শব্দটি হাঁকতে শুরু ক'রে দিলে। মোট কথা, লজঞ্চুস্ চুষে-চুষে উপভোগ করার বাণীমূর্ত্তি সে ফুটিয়ে তুলতে লাগল সেই তৃতীয় প্রহরের রোদে পথে দাঁড়িয়ে।

এদিকে মাষ্টার মশায় দুই হাতে বাজনা বাজাচ্ছেন আমাদের ওপর—চটাচট, পটাপট। মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একই সঙ্গীত—কাঁদিয়ে তবে ছাড়্‌ব। আর আমরা কাঁদতে-কাঁদতে উচ্চৈস্বরে হেসে চলেছি হা হা, হো হো, হি হি—

এই অভূতপূর্ব কনসার্টের শব্দে বাড়ীর সবার নিবানিদ্রা ছুটে গেল, তাঁরা দুদ্দাড় ক'রে এক রকম ছুটেই নীচে নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু তখন দু-পক্ষই অর্ধক্ষিপ্ত। তাঁদের দেখে মাষ্টার মশায়ও হাত থামালেন না, আমরাও আগের মতনই হাসতে থাকলুম।

ইতিমধ্যে মা এসে ঘরে ঢুকলেন—উভয় পক্ষেরই ইজ্জৎ বাঁচল।

মাকে দেখে মাষ্টার মশায় ও আমরা থেমে গেলুম। মা আমাদের বলতে লাগলেন—তোমরা বড় বাড় বেড়েছ! আচ্ছা হচ্ছে তোমাদের—

মা যেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল! অনেক লোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ও মধ্যে-মধ্যে মুথিয়ার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল। অন্য সময় হোলে আমারা ছুটে বেরিয়ে যেতুম, কিন্তু মাথার ওপরে অত-বড় একটা অপরাধের বোঝা থাকায় তখনকার মতন উত্থান-শক্তি রহিত হ'য়ে গিয়েছিল।

গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। কি রকম হোলো তাই ভাবছি, এমন সময় মনে পড়ল আজ যে শনিবার।

আবার বাবার আওয়াজ পাওয়া গেল। মা আমাদের বললেন—দেখ তো, কি হয়েছে?

বলা-মাত্র তড়াক ক'রে বেরিয়ে গেলুম। বাইরে গিয়ে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার! রাজ্যের লোক দাঁড়িয়েছে মুথিয়াকে ঘিরে! তার লজঞ্চুস রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়েছে, কাঠের কাণা-উঁচু ডালাটাও এক দিকে পড়ে রয়েছে। মুথিয়ার হাত-পা ও মুখের স্থানে-স্থানে ছ'ড়ে গিয়েছে—দু-চোখ দিয়ে জল ঝরছে, কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না।

করুণ সে দৃশ্য দেখে আমাদের চোখে জল বেরিয়ে এল। সেখানকার তকাতর্কি—শুনে ব্যাপারটি যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—

পাড়ার গুটিকয়েক লোক ছিলেন বেকার। মুখিয়া নাকি প্রতিদিন বীভৎস হুঙ্কার ছেড়ে তাঁদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। এত দিন তাঁরা নীরবে তার এই অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছিলেন,কিন্তু আজ নাকি খুব বাড়াবাড়ি করায় নিতান্ত সহ্য করতে না পেরে অসময়ে স্বপ্নাগার ছেড়ে এই রোদে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন তাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে। অধ্যাপনার কার্য্যটি প্রায় সুসম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছিল, এমন সময় বাবা এসে তাঁদের হাত থেকে মুখিয়াকে উদ্ধার করেছেন—এই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

বাবা বলতে লাগলেন—ছি ছি, আপনারা কি মানুষ! এই পঙ্গুকে ধরে তিন-চার জনে মিলে মারতে একটু মায়া হোলো না আপনাদের?

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললে—মশায়, আপনি যা রাগী, আপনি হোলে মেরেই ফেলতেন ওকে।

বাবা চুপ ক'রে আছেন দেখে আর এক ব্যক্তি বললে—আপনিও তো মশায় আচ্ছা লোক! পাড়ার লোকে একটা কাজ না হয় ক'রেই ফেলেছে। আপনি কোথায় সেটা চেপে যাবেন, না উল্টে ওর হ'য়ে লড়াই শুরু করেছেন! আশ্চর্য!

তিনি কোনো জবাব দেবার আগেই আর এক জন বলে উঠ্‌লে—ছেলেদের বন্ধু যে!

ভীড়ের লোকেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

বাবা আর তাদের কথার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা না ক'রে ছেলেদের বন্ধুর রূপখানি দেখতে লাগলেন। রূপ-তরাস কেটে গেলে মুখিয়ার এক-খানা হাত ধরে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

মুখিয়ার অবস্থা দেখে বাড়ীর সবাই দুঃখ করতে লাগলেন। মা তাকে জেরা করলেন—তুই এ-বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিলি কেন?

তারপর আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে বললেন—নিশ্চয় এদের ডাকছিলি! বল, তোর কোনো ভয় নেই।

মুখিয়া বললে—চলতে চলতে-ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেঁচানোই আমার অভ্যেস—ওদের ডাকবার আমার কি দরকার!

মা বললেন—আমি জানি, এরা তোর কাছে ধার ক'রে লজঞ্চুস খায়—এদের কাছে কিছু কি পাবি?

সঙ্গে-সঙ্গে মুখিয়া প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না না না, কিছু পাব না—ওরা আর ধারে খায় না।

এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে খেয়ে মুখিয়া তার শূন্য ডালাটা বগলে নিয়ে চলে গেল।

মুখিয়া চলে যাবার পর এই ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর সকলেই আলোচনা করতে লাগলেন। বাবা ও মাষ্টার মশাই দু-জনেই এই নিয়ে অনেক কথা বললেন।

বাবা বললেন—কেউ কারুকে ধরে মারছে, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি না। বিশেষ ক'রে সে ব্যক্তি যখন উল্টে মারতে পারবে না।

মাষ্টার মশায়ও দেখলুম এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে একেবারে একমত।

সেদিন দিবানিদ্রায় ব্যাঘাতের জন্য যাঁরা মুখিয়ার অঙ্গে ব্যথা দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই দিবানিদ্রা থেকে গভীরতর নিদ্রায় অপসৃত হয়েছেন—জানি না, আজও নিদ্রা ভেঙেছে কি না।

মাষ্টার মশায় কিন্তু পরদিন থেকে আর এলেন না। সে জন্য দুঃখ নেই, কারণ মাষ্টারের অভাব জীবনে কোনো দিনই ভোগ করতে হয়নি, কিন্তু মুখিয়া আর এল না, যার অভাবে মনের একটা জায়গা আজও খালি হ'য়ে আছে।

রাস্তা-ধারের জানালায় বসে আছি—পথ ক্রমেই জনবিরল হ'য়ে উঠছে। বেরিয়েছে দুপুর বেলাকার যত ফেরিওয়ালার দল। সে সময় অধিকাংশ বাড়ীরই বাবুদের দল বাড়ীতে থাকে না—মেয়েদের কাছে জিনিষ বিক্রি করা সহজ।

ঐ যায় চুড়িওয়ালা—বেলোয়ারি চুড়ি চাঁইয়া—বালা চাঁইয়া—খেলোনা চাঁইয়া—

তখনকার দিনে সব বাড়ীরই রাস্তার দিকের বারান্দায় নীল কাপড়ে মোড়া চিক্ ঝুলত। রাস্তায় চলা, ট্রামে-বাসে চড়া, কিংবা বাজার করবার ছলে সকাল থেকে দোকানে-দোকানে ঘুরে-ঘুরে সঙ্গের পুরুষ জীবগুলিকে নিম-খুন ক'রে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে ঘণ্টা দুয়েক হুল্লোড় ক'রে কল-ঘরে ঢোকবার রীতি বা সাহস তখনকার মেয়েদের ছিল না।

চুড়িওয়ালা হেঁকে চলেছে সুর ক'রে—এক বাড়ীর ওপরকার বারান্দার চিক্ ফাঁক ক'রে সরু-গলায় কে যেন ডাকলে—চুড়িয়ালা!

চুড়িওয়ালার সজাগ কান নারীকণ্ঠের এই ক্ষীণ আহ্বানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

সে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ বাড়ী গো?

—এই যে, এই বাড়ী।

সদর দরজা খুলে গেল। চুড়িওয়ালা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল—তার পেছনে পেছনে পাড়ার একপাল ছোট ছেলেও ঢুকে পড়ল।

চুড়িওয়ালা উঠোনে তার সেই বিরাট ঝোড়া নামিয়ে একখানা চার-চৌকো পিচবোর্ডের টুকরো দিয়ে হাওয়া খেতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে বাড়ীতে যত মেয়ে আছে তারা একে-একে চুড়িওয়ালার সামনে এসে

দাঁড়াতে লাগল—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী, বালিকা, শিশু—গৃহিণী, দাসী, কন্যা, বৌ—সধবা, বিধবা, পতিসোহাগিনী বা পতিপরিত্যক্তা কেউ বাদ গেলেন না।

চুড়িওয়ালা তার বোচকার বাঁধন খুলে ফেলল। ওপরেই নানা রকমের খেল্না, বাঁশী, চক্চকে ফুলদানী ইত্যাদি মনোহারী জিনিষ। দেখামাত্র ছেলেদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হোলো—তারা সবাই মিলে সশব্দে এই জিনিষগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও নিজেদের অভিজ্ঞতা জাহির করতে লাগল। এরই মধ্যে মেয়েদের চুড়ি দেখানো আরম্ভ হোলো।

এই চুড়িওয়ালারা প্রায়ই ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান। কথাবার্ত্তা ছিল মিষ্টি, মুখে একেবারে মধু মাথানো যাকে বলে। তাদের অমানুষিক তিতিক্ষা আজকের দিনে যে কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দুর্লভ। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারা সংসারে কোন মহিলার স্থান কোথায় তা বুঝে নিয়ে বড়মা, ছোটমা, বৌমা, দিদিমণি প্রভৃতি ডাক শুরু ক'রে দিত।

তার পরে সেই মেয়ে-সভায় চুড়ি পছন্দ করানো—বাঁকা-মুটের পক্ষে অতি জটিল-রকমের অপারেশন করাও বোধ হয় তার চাইতে সোজা। একটা দৃষ্টান্ত দিই—

পাঁচ জন মহিলা ও একটি ছোট মেয়ে হয়ত চুড়ি পরবে। প্রথমে ছোট মেয়েটির চুড়ি পছন্দের পালা। পঁচিশ রকমের চুড়ি দেখাবার পর এক রকম চুড়ি পছন্দ হোলো। দরে আর কিছুতেই বনে না। চুড়িওয়ালা বার-দুয়েক তার বোচকা বেঁধে ফেল্লে। শেষকালে সব ঠিক হ'য়ে যাবার পর চুড়ি পরাতে যাচ্ছে, এমন সময় এক জন বলে উঠলেন যে, তাঁর মামার বাড়ীর পাড়ায় একজনের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে একটি ছোট মেয়ের হাতে দু-গাছি চুড়ি তিনি যে দেখেছিলেন—আহা, সে একেবারে চোখ জুড়িয়ে যায়!

চুড়িওয়ালাকে সেই চুড়ির বিবরণ শুনিয়ে বলা হোলো—সেই রকম চুড়ি দেখাও।

চুড়িওয়ালা অতি বিনীতভাবে বললে—না মা, সে রকম চুড়ি আমার কাছে আজ নেই, বলেন তো এনে দিতে পারি।

খুকুর মা এই সুযোগে খুকুকে ফাঁকি দেবার তালে তাকে বললেন — তোকে ভাল চুড়ি পরে এনে দেবে, আজ আর চুড়ি পরিস্‌নি।

খুকু অমনি পোঁ ধরলে। সকলে মিলে তাকে বোঝাতে লাগলেন যে অচিরেই তার জন্য এমন ভাল চুড়ি আসবে যে সে রকমটি আর কারুর হাতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

বাক্যটির ব্যঙ্গার্থ ধরে ফেলে খুকুমণি তার সুর আরও এক গ্রাম উচ্চে তুলে দিলে। খুকীর মা সহ্য করতে না পেরে রেগে তাকে দিলেন ঘা দু-তিন।

কিন্তু খুকু তো আর খোকা নয়। যে-পাপ থেকে তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে সে-পাপে সহজাত অধিকার নিয়েই যে সে এসেছে—সে থামবে কেন! একটা মহা হট্টগোলের পর সাব্যস্ত হোলো, আচ্ছা তা হোলে ঐ চুড়িই খুকীকে পরিয়ে দেওয়া হোক।

খুকীর বেলাতেই যদি এই হয় তা হোলে খুকীর মা, খুড়ী, জেঠিদের ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়।

এর পরে চুড়ি পরবার পালা। সে এক লাঠালাঠি, কাটাকাটি ব্যাপার! কারণ, সকলেই চান যে, চুড়ি হাতের কব্‌জিতে একেবারে সেঁটে বসে যাবে। তাঁদের অধিকাংশের কব্‌জিতেই যে ছোট মেয়েদের মল সেঁটে বসে যাবার অধিকার রাখে, এক সোনার চুড়ি গড়াবার সময় ছাড়া সে খবরটা তাঁরা প্রায় একেবারে ভুলেই যেতেন। সেই গুণ-ছুঁচের ছ্যাঁদায় জাহাজের কাছি গলাবার কসরৎ বালক-মহলে খুবই উপভোগ্য ছিল।

এত কাণ্ডের পর, বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক বাদে চুড়িওয়ালা এক বাড়ী থেকে মুক্তি গেল। এত ক'রে তারা লাভ করত কি ক'রে তাই ভাবি—কারণ পরাতে-পরাতে চুড়ি ভেঙে গেলে তা চুড়িওয়ালার যেত—বোধহয় চুড়ি পরানোটুকুই ছিল তাদের লাভ।

চলেছে ফেরিওয়ালা এক-এক জন এক এক সুরে হেঁকে—আমাদের মগজে চিত্রবহার তরঙ্গ তুলে। বাসনওয়ালা চলেছে, তারা হাঁকে না—বাজায়। রকমারি বাজনা সে—গিন্নিরা শুনেই বলে দিতে পারতেন, কার কাছে কি ধরণের বাসন পাওয়া যায়। ঐ যায় বেদের মেয়ে, পিঠে পোঁট্‌লা বাঁধা। ক্ষীণ দেহযষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে ভারতের রাজধানীর বুকের ওপর দিয়ে ঘোষণা করতে-করতে চলেছে—ব্যাত ভালো করি—দাঁতের পোকা বের করি—এমন মন্ত্র ঝাড়বে যে দাঁতের পোকার বাবা তো দূরের কথা তাদের তিন কুলে যে যেখানে আছে পিল্-পিল্ ক'রে বেরিয়ে আসতে পথ পাবে না। শুনতুম ওরা না কি আরও অনেক সাংঘাতিক রকমের তুক্-তাক্, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র জানে, কিন্তু ছাড়ে না।

ঐ আসে মাড়োয়ারী কাপড়ওয়ালা—রামশিঙের মতন আওয়াজে পাড়া কাঁপিয়ে—একটি—য়াকায়—তিন খা—না কাপড়—এক্‌খি—য়ানা কাউ!!!

টাকায় চারখানা ধুতি! হোক না কেন সে পাঁচ-হাতি! আজ যে একখানা রুমালের দাম পাঁচ সিকে। কিন্তু আশ্চর্য! সেদিনও মাতব্বরদের মুখে শুনেছিলুম—কি দুর্দিনই না পড়েছে!

দুর্দিনের জয়ডঙ্কা কালের বুকে চিরদিনই বেজে চলেছে। মানুষ রাজ্য জয় করবার কৌশল শিখেছে বটে কিন্তু দুর্দিনের কাছে তাকে চিরকাল হার-মানতে হয়েছে।

এই দুপুরের যাত্রীদের মধ্যে আর এক জনের কথা মনে পড়ছে—সে ছিল ভিখারী, অন্ধ ভিখারী। খুব লম্বা-চওড়া ও হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ছিল

তার—বিশেষ কোরে পা দু-খানা ছিল তার অদ্ভুত। অত বড় লম্বা-চওড়া ও শক্তিব্যঞ্জক পা পালোয়ানদের মধ্যেও দুর্লভ। ডান হাতে তার মাথা সমান উঁচু একটা মোটা বাঁশের লাঠি ঝুলত আর বাঁ হাতে ঝুলত একটা রোগা কালো মতন প্যাংলা মেয়ে।

অন্ধ আবার গান গাইত। যেমন ছিল তার বিরাট দেহ, তেমনি ছিল তার কণ্ঠস্বর। উঃ, সে যেমন গম্ভীর, তেমনি কর্কশ ও তীক্ষ্ণ। কিন্তু গাইয়ে হওয়ার পক্ষে এতগুলি প্রতিকূল গুণাবলীর সমাবেশ সত্ত্বেও তার গান পড়শীদের বুকে করুণার প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিত, এমনি দরদ ছিল তাতে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে কর্কশ কণ্ঠে, কিন্তু তার সমস্ত অক্ষমতা ভেদ ক'রে হৃদয়-বেদনা শতধা উৎসারিত হচ্ছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে, সে গান নিশ্চয় তার নিজের রচনা নয়। চমৎকার গান—অন্ততঃ সে সময় খুবই ভাল লাগত। আজ সে গানের কথা ও সুর স্মৃতি থেকে মুছে গেলেও ভাবটা মনে আছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে—অন্ধের যা কষ্ট তা ধৃতরাষ্ট্রই জানেন আর জানেন সেই অন্ধ মুনি—তিন যুগের ব্যথার ঢল নামল স্তব্ধ দুপুরের বুকে! গান গেয়ে চলতে-চলতে এক জায়গায় এসে অন্ধ দাঁড়িয়ে বললে—মা জননী, অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই মেয়েটা পিঁ-পিঁ শব্দে টেনে-টেনে সুর ক'রে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে—মা গো, দয়া ক'রে অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

হয়ত কোনো গৃহস্থবধূ তাকে একটা পয়সা দিলে কিংবা কেউ-ই কিছু দিলে না। অল্প কিছুক্ষণ চেঁচামেচি ক'রে আবার অন্ধ ফিরলে সামনের দিকে, আবার সুরু হোলো সেই গান আবার সুরু হোলো তার যাত্রা।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে—আমি শুনেছি মাথার ওপরে নাকি আকাশ আছে, তার রং নাকি নীল। রাত্রিবেলা নাকি আকাশে

ঝক্‌ঝকে সব তারা ফোটে, সে দৃশ্য নাকি খুব সুন্দর। কিন্তু নীল বা ঝক্‌ঝকে কাকে বলে তা আমি জানি না—আমি তো অন্ধ।

তার সেই নিদারুণ অভিযোগ আমাদের অন্তরে যে তরঙ্গ তুলত তা একমাত্র বালক-মনেই সম্ভব।

অন্ধ গেয়ে চলল—শুনেছি নাকি গাছে নানারকম ফুল হয়, বিচিত্র তাদের রং ও রূপ। সেখানে না কি প্রজাপতি ওড়ে, তাদের রং ও রূপ বিচিত্রতর। হায়! আমি যে অন্ধ, আমার কিছুই দেখা হোলো না।

তার গানের মধ্যে একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে যেটা শাশ্বত সত্য। প্রত্যেক লোকেই জীবনে তা হয়ত বহুবার উপলব্ধি করেছেন। সে কথাটি হচ্ছে—আঁখি নেই বিধি দিলি আঁখি জল—

এই অন্ধের সঙ্গে ছেলেবেলার আর একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমাদের বাড়ির প্রায় সামনেই একজনেরা থাকতেন। ভাড়াটে বাড়ি হোলেও বেশ বড় বাড়ি, অবস্থা সচ্ছল ছিল তাঁদের। ছেলেরা দু-জন কলেজে পড়ত আর দু-জন চাকরী করত। বাড়ির কর্তা ভাল চাকরি করতেন—চোগা চাপকান পরে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়াটে গাড়ি চড়ে রোজ আপিসে যাওয়া-আসা করতেন। এ ছাড়া দেশে জমি-জমা ছিল এবং সেখান থেকে আমদানীও মন্দ ছিল না। সেখান থেকে প্রায় তরি-তরকারী ও ফল-মূল আস্‌ত এবং বাড়ির গিন্নি পাড়ার প্রায় সব বাড়িতেই সে সব জিনিষ বিতরণ করতেন। তাঁদের বাড়িতে ছোট ছেলে-পিলে কেউ ছিল না বটে, কিন্তু গিন্নির মেজাজ ও ব্যবহারটি এমন মধুর ছিল যে পাড়ার অধিকাংশ ছোট ছেলে ও মেয়েদের আড্ডা ছিল সেখানে! বাড়ির কর্তা মাঝে-মাঝে ছেলেদের চার নম্বরের ফুটবল কিনে দিতেন—বিকেলে তাঁদের বড় উঠোনে আমরা খেলতুম। পাড়ার প্রায় সব ছেলেই এখানে যাতায়াত করলেও আমরা দু-ভাই এদের ভারি প্রিয়পাত্র ছিলুম, বোধ হয় সামনা-সামনি বাড়ি থাকায়।

কিছু দিন পরে বাড়ির বড় ছেলের বিয়ে হোলো। বিয়ে, বৌভাত প্রভৃতি সেরে তাঁরা দেশ থেকে ফিরে এলেন। আমরা বৌ দেখলুম। জমিদারের মেয়ে, রং খুব ফর্সা না হোলেও বেশ দেখতে—বছর চোদ্দ-পনেরো হবে। চমৎকার হাসি-হাসি মুখ, টানা-টানা চোখ। বিদেশে শ্বশুরবাড়িতে এসে তখনকার দিনে মেয়েরা যে-রকম কান্নাকাটি করত তার সে রকম কোন বালাই ছিল না, বরং আমাদের মতন এতগুলি বাচ্ছা দেওর দেখে সে বেশ খুশিই হ'য়ে উঠল। কনে-বৌ অবস্থাতেই সে একদিন গাছ-কোমর বেঁধে আমাদের সঙ্গে উঠোনে নেমে পড়ল, ফুটবল খেলতে। কিন্তু সে ঐ এক দিনই, খুব সম্ভব তার শাশুড়ী বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সমানে ঝগড়া ক'রে ড্যাংগুলি খেলেছে।

যা হোক, ঐটুকু মেয়ে—আমাদের চাইতে আর কতই বা বড় ছিল সে, সেই এক পাল ছেলেকে সে একবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিল। এমনি ছিল তার আকর্ষণী শক্তি। মুখের কথা খসবার আগেই আমরা তার কাজ ক'রে দিতুম। বৌদির কোনো দুঃখই ছিল না, অন্তত আমরা বুঝতে পারতুম না—তবে বাড়ী থেকে একলা বেরিয়ে নিজের ইচ্ছামত এর-তার বাড়ীতে ঘুরে-ঘুরে গল্প করা অর্থাৎ মনের সুখে পাড়া-বেড়াতে পারে না বলে মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে চাপা দুঃখ প্রকাশ করত।

একদিন দুপুর বেলা আমরা দু-ভাই এই রকম জানালায় বসে আছি, দূরে অন্ধ ভিখারীর গান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, মুখ তুলতেই চোখ পড়ল, বৌদি বারান্দার চিক্ ফাঁক ক'রে দূরে অন্ধকে দেখবার চেষ্টা করছে। অন্ধ তাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সে বারান্দা থেকে সরে গেল।

একটু বাদেই দেখলুম, বৌদি তাদের সদর দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে

রাস্তার দু-দিকে দেখতে লাগল—লোকজন কেউ কোথাও আছে কি না! গ্রীষ্মের দুপুর, রাস্তায় লোকজন নেই, খাঁ-খাঁ করছে—একমাত্র সেই ভিখারী ও তার হস্তলগ্ন কন্যা ছাড়া।

ভিখারী বাড়ীর সাম্‌নে বরাবর আসতেই বৌদি দরজা খুলে বেরিয়ে টপ্‌ ক'রে তাদের বাড়ীর রকে উঠে পড়ল। রকের ঠিক নীচেই একেবারে ভিতের গা-ঘেঁষে হাত-দুই চওড়া একটা নর্দমা ছিল—সে সময়ে শহরে অনেক রাস্তাতেই দু-পাশের বাড়ির গা দিয়ে এই রকম খোলা নর্দমা থাকৃত।

দেখলুম, বৌদি বিনা আয়াসে একটি লম্ফে একেবারে নর্দমা টপ্‌কে রাস্তায় পড়ল। তার পরে ভিখারীর হাতে পয়সা দিয়েই মারলে দৌড় বাড়ির দিকে।

ভিখারীর আশীর্বাণী তখনো শেষ হয়নি—দরজার সামনেই আমের খোশায় পা পড়ে বৌদি সশব্দে আছাড় খেল, সেই নর্দমা-ঢাকা পাথরের ওপরে।

ভিখারী গান গাইতে-গাইতে চলে গেল! আমরা দেখছি, বৌদি আর ওঠে না। দু-একবার ঘেঁষড়ে, ঘেঁষড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে এলিয়ে পড়ল!

আমরা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু আমাদের সাধ্য কি যে তাকে তুলি! শেষকালে কোনো রকমে হেঁচ্‌ড়ে-টেনে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলুম।

বৌদি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই দাঁড়াতে কিংবা চলতে পারলে না—কাঁদতে-কাঁদতে আমাদের বললে—কোনো রকমে আমাকে ঘরে নিয়ে চল।

দুই ভাই তার দুই হাত ধরে ছেঁচ্‌ড়াতে ছেঁচ্‌ড়াতে ওপরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। যন্ত্রণার চোটে দেখতে-দেখতে

তার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। আমরা তার কষ্ট দেখে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে তার শাশুড়ীকে ডাকবার উপক্রম করছি দেখে সে বললে—এখন যা, বিকেলে আসিস্—কারুকে কিছু বলিস্নি যেন!

বিকেলে সেখানে যাওয়া হয়নি। সন্ধ্যা বেলা মা বললেন—ও-বাড়ীর বৌমার কি হয়েছে, দু-দু-জন ডাক্তার এল।

পরের দিন বিকেলে বৌদিকে দেখতে গেলুম। এক দিনেই তার চেহারা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, শুনলুম, কল-ঘরে পড়ে গিয়ে তার পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছে, কাল সকালে অজ্ঞান ক'রে হাড় জোড়া লাগানো হবে।

একটু নিরালা হ'তেই বৌদি আমাদের বললে—একটা কথা বলব, রাখবি ভাই?

—নিশ্চয় রাখব।

—আমি এদের বলেছি যে কল-ঘরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে। ভিকিরিকে পয়সা দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলুম জানতে পারলে এরা আর আমায় আস্ত রাখবে না। লক্ষ্মী ভাই, তোরা কারুকে কিছু বলিস নে যেন।

পরদুঃখকাতরতা তখনকার দিনেও গুণ বলেই বিবেচিত হোতো, কিন্তু পরদুঃখে কাতর হ'য়ে বৌ-মানুষের রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া অমার্জ্জনীয় ছিল।

বৌদির পায়ে কাঠ বসিয়ে ব্যাণ্ডজ বাঁধা হোলো বটে, কিন্তু অসুখ তার আর সারল না। দিনে-দিনে নানা উপসর্গ জুটে অবস্থা ক্রমেই জটিল হ'য়ে উঠতে লাগল। দেশ থেকে তার বাপ-মা এলেন, সায়েব ডাক্তারও এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। দু-দিনের জন্য এসে সবাইকে আপন ক'রে, পাড়াশুদ্ধ ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে এক দিন সে চলে গেল।

বিশ্বাস ক'রে এক দিন সে আমাকে যে ঋণে আবদ্ধ করেছিল আজ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সে ঋণ শোধ করলুম।

জানালার ধারে বসে আছি—বাইরে জগৎ গড়িয়ে চলেছে, রোদও গড়াতে-গড়াতে গলি পেরিয়ে চলে গেল। ঠিকে-ঝিরা সব কাজে আসতে লাগল। বিকেল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার রংই বদলে গেল।

দুপুরের ফেরিওয়ালার দল চলে গেছে অনেক দূরে। বিকেলের ফেরিওয়ালারা প্রায় খাবার-দাবার ও সৌখিন জিনিষ বিক্রি করে। একটা জিনিষ সেকালে খুবই চলত, সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ-বেকারির পাঁউরুটি-বিস্কুট। মাথায় টিনের বাক্স, খালি গায়ে গলায় লম্বা পৈতে-ঝোলানো ব্রাহ্মণ ফেরিওয়ালার দল বেরুত। শীতকালে জামার গলার কাছে পৈতের খানিকটা বের করা থাকত। সেদিনের হিসেবেও সেগুলো ছিল যাচ্ছে তাই খাদ্য। সে সময় পাঁউরুটি খাওয়ার রেওয়াজ খুবই কম ছিল, বিশেষ ক'রে মুসলমানের দোকানের কিংবা গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের পাঁউরুটি অধিকাংশ বাড়ীতেই ঢুকতে পেত না।

চলেছে বিকেলের ফেরিওয়ালার দল—ঘুগ্‌নিদানা, নকলদানা, চীনে-বাদাম, চানাচুর, পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের ঘুগনি, আলু-কাচালু, প্রভৃতি যত সব মুখরোচক ও প্রাণঘাতক অখাদ্য। পাঁঠার ঘুগ্‌নি, ডিমের ঘুগ্‌নি ছেলেরা লুকিয়ে খেত। সাধারণ লোক প্রকাশ্যে মুরগী অথবা মুরগীর ডিম খাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। হাঁসের ডিমও অনেক বাড়ীর হেঁসেলে ঢুকতে পেত না, বিশেষ ক'রে যে বাড়ীতে উড়ে-বামুন পাচক থাকত। এই উড়ে-বামুনের প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ল।

সেকালে, শুধু সেকালে কেন, একালেও অনেক বাঙালী গৃহস্থের বাড়ীতেই উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ রাখা হয় রান্না করবার জন্য। কেন জানি না, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ডিমের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। আমাদের একটি বিশেষ জানালোক উড়িষ্যার কোন দেশীয় রাজ্যে চাকরী

করতেন। মাঝে-মাঝে ছুটিতে তিনি বাড়ীতে অর্থাৎ কলকাতায় এসে কিছু দিন ক'রে কাটিয়ে যেতেন। এই রকম সময়ে এক দিন সকাল বেলায় ভদ্রলোক বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, এমন সময় সামনের বাড়ীর ঠাকুর কি কাজে বেরুচ্ছিল—পড়ে গেল তাঁর সামনে। লোকটাকে তিনি চিনতেন, কারণ চাকুরী-স্থানে তাঁর বাগানে সে দিন-কয়েক মালীর কাজ করেছিল। সে ছিল জাতে 'পান' অর্থাৎ হাড়ি-মুচী শ্রেণীর—কলকাতায় এসে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে বামুন সেজে লোকের জাত মেরে বেড়াচ্ছিল। যেখানে সে কাজ করত, তাঁরা ছিলেন অব্রাহ্মণ। তাই রাঁধুনী-বামুন হোলেও শাপমন্যির ভয়ে তাঁরা তাকে যতদূর সম্ভব সম্ভ্রম ক'রেই চলতেন। কিন্তু যাঁহাতক প্রকাশ হওয়া যে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয়, অমনি পাড়ার লোকদের সঙ্গে তাঁরাও তাকে ধড়াধ্বড় পিটতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। লোকটা তো পালিয়ে বাঁচল—তখুনি ঠিকে-গাড়ি চড়ে বাড়িশুদ্ধ ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁরা গঙ্গা নাইতে ছুটলেন এত দিনের হজম-করা পাপ খণ্ডাবার জন্য। সেদিন আর তাঁদের বাড়ী হাঁড়ি চড়ল না। এ রকম ব্যাপার নিত্য ধরা না পড়লেও অনেক অব্রাহ্মণকে কলকাতায় এসে দায়ে পড়ে যে ব্রাহ্মণ হ'তে হোতো সে কথা বলাই বাহুল্য।

ছাতে

ছাতের ছবি সারাদিন ধরেই বদলে চলত সেকালে। বাড়ীর সব চাইতে উচ্চে ও সবার মাথার ওপরে থেকেও প্রতিদিন নিজের অঙ্গে সে এত ধূলো মাখে কোথা থেকে, ছেলেবেলা সে একটা সমস্যা ছিল। তা ছাড়া, আর এক রকম কালো-কালো গুঁড়ো, ধুলোর চেয়ে একটু শক্ত জিনিষ—সেগুলোই বা কি? দু-পা চলতে না চলতে পায়ের তলাটা একেবারে কালো হ'য়ে যায়!

খুব ভোরে ছাতে উঠে দেখেছি, দূরে এক বাড়ির ছাতে এক জন সদ্য-রোগমুক্ত—রাস্তায় বেরুবার শক্তি নেই কিন্তু চলচ্ছক্তি আছে, ধীরে-ধীরে বেড়াচ্ছে। দু-এক জন অতি-বৃদ্ধকেও দেখেছি, এই সময় ছাতে উঠে তাঁরা আয়ু বাড়াবার চেষ্টা করতেন। রোদ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু এই দল নীচে নেমে যেতেন। ব্যস্, বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে ছাতের সম্পর্ক এই পর্যন্ত। কারণ, অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে আসার পূর্বে পুরুষেরা আর ছাতে উঠতে পারতেন না—পাড়ায় সদ্ভাব রেখে যাঁরা থাকতে চাইতেন তাঁরা এ নিয়মটির প্রতি খুবই সজাগ থাকতেন।

বৃদ্ধ ও রুগ্নের দল নেমে গেলে ঝি উঠল ছাত ঝাঁট দিতে আর সন্ধ্যেবেলায় মেলে-দেওয়া কাপড়ের আণ্ডিল কুঁচিয়ে, পাট ক'রে তুলতে। এই ছাত ঝাঁট দেবার সময়টা ছিল তাদের সকালবেলা বিশ্রামের সময়। একবার ছাতে চড়তে পারলে আর নামবার নামটি নেই। নীচে থেকে গিন্নিরা চেঁচাচ্ছেন, ঝিয়ের কানেও পৌচচ্ছে না। যদি বা একবার সাড়া দিলে তো কাজ তখনো অনেক বাকি। শেষ

কালে গালাগালি দিয়ে এক রকম টেনে তাকে নীচে নামানো হোলো—এ ব্যাপার প্রায় প্রতি সংসারেই প্রতিদিনকার ব্যাপার ছিল। অনেক গিন্নিকেই বলতে শুনেছি যে, ওরা সারা রাত জাগে কি না তাই ছাতে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আসল কথা, তারা ছাতে গিয়ে ঘুমোত না, সেখানে গিয়ে জেগে উঠত।

তখনকার দিনে, শুধু তখন কেন এখনকার দিনেও ঝি-রা থাকে বস্তির মধ্যে খোলার বাড়ীতে। সে সব বাড়ী আমরা দেখেছি। ছোট্ট একখানা ঘর, মাটির দেওয়াল, মাটির মেজে, খোলার চাল। হয়ত কোনো ঘরে একহাত চৌকো বাঁশের জালি দেওয়া একটু জানালা। সে মেজেতে শোওয়া যায় না, তাই তক্তাপোষ একখানা করতেই হয়। তক্তাপোষের চারটে পায়ার নীচে ইট দিয়ে-দিয়ে সেখানাকে যত দূর সম্ভব উঁচু করা! কারণ, তক্তাপোষের নীচে সেই জায়গাটুকুতে হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন, ভাঁড়ার, জলের কলসী, পানের বাসন প্রভৃতি থাকে এবং সেইখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া চলে।

পাশাপাশি ঘর প্রায় চারদিকেই, মাঝখানে ছোট্ট একটি উঠোন। উঠোনের এক কোনে একটা কুয়ো। এই কুয়োর জলই ব্যবহৃত হয়, যার গতর আছে সে রাস্তার কল থেকে খাবার জল সংগ্রহ করে। ঘরের সামনে হাত-তিনেক চওড়া একটু বারান্দা মতন, এই বারান্দা অথবা দাওয়া যার ঘরের সামনে যতটুকু পড়েছে সেইটুকু রান্না করবার জায়গা। দাওয়ার চালটা উঠোনের দিকে এতখানি ঝোলা যে,যে-কোনো সাইজের বয়স্ক লোককে প্রায় গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হয়, অসাবধান হোলে মাথা বাঁচানো দায়। ঘরে আলো-বাতাস একদম ঢোকে না বললেই চলে। শব্দ শুনে টের পেতে হয় যে বাইরে ঝড় উঠেছে কিন্তু চার ফোঁটা বৃষ্টি হোলেও তা চালের ফাঁক দিয়ে ঘরে পড়ে। তার ওপর বাড়ীর মধ্যে কি গন্ধ! উঃ, সে কথা মনে করলেও পাপ হয়!

এই নরককুণ্ডের মধ্যে বাস ক'রে মনিব-বাড়ীর উঁচু ছাতে উঠে সকাল বেলাকার সেই ঝল্‌মলে আলো, দূর-দিগন্ত অবধি উঁচু, নীচু ছোট বড় বাড়ী, এর মধ্যে-মধ্যে নারকোল ও কেষ্টচূড়া ফুলের গাছ, কোন্ দূরে কলের চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, কোন মন্দির-চূড়ার স্বর্ণকুম্ভ ঝক্-ঝক্ করছে ! অনেক-অনেক দূরে মনিমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে. প্রথম দৃষ্টিতেই আবার তাকে দেখা যায় না. উঁচু-উঁচু বাড়ীগুলোর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকে—এ সবই যে তার কাছে নতুন, তার জীবনযাত্রার সীমার বাইরে। এই বিস্ময়লোকে জেগে উঠে তারা আত্মহারা হ'য়ে যেত—গিন্নির কর্কশ চীৎকারে সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার কাজে লেগে যেত।

এ আমার কল্পনা নয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে একজন ঝি ছিল, তাকে আমরা জন্মাবধিই দেখেছি। খুব বয়স হয়েছিল তার, কোমরটা এমন বেঁকে গিয়েছিল যে হাঁটবার সময় নীচের দিকে মুখ ক'রে চল্‌ত। ভোর হ'তে না হ'তে সে আসত। বল্‌ত, সারা-রাত ঘুম হয় না, রাত পোয়ালেই বেরিয়ে পড়ি। বেলা দশটা নাগাদ চলে যেত আবার আসত তিনটেয় আর বাড়ী ফিরত রাত্রি ন-টায়—কোন দিন আমরা আব্দার ধরলে রাত্রে বাড়ী যেত না—আমাদের কাছে শুয়ে গল্প বলত।

শরতের মাকে কোন কাজ করতে হোতো না শুধু আমাদের, অর্থাৎ ছোট ছেলেমেয়েদের তদারক করতে হোতো। সে কাজ যে কতখানি শক্ত তা যেদিন সে কামাই করত সেদিন বাড়ীর সবাই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারতেন। শরতের মা তার নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনীগুলোকে খুব মর্মস্পর্শী ক'রে বলতে পারত। প্রধানত এই গুণেই সে আমার মতন সাংঘাতিক দুষ্টু ছেলেকেও বশে এনেছিল। তারই মুখে শুনেছি যে প্রথম-প্রথম চাকরী করতে এসে ছাতে গিয়ে চারিদিকের দৃশ্যের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলত—দু-তিন জায়গায় এই অপরাধে চাকরীও গিয়েছে।

শরতের মার আর একটি গুণ ছিল এই যে, তাকে য'কে-ঝ'কে গালাগালি দিয়ে কেউ রাগাতে পারত না। গালাগালি দিলে সে ফোক্লা মুখ হাঁ ক'রে হাসতে থাক্ত। দুঃখ পেয়ে-পেয়ে সংসারের কাছে এমন নিঃশেষে সে আত্মসমর্পণ করেছিল যা 'যোগিজনোচিত' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শরতের মা বল্ত যে খুব ছোটবেলা থেকেই সে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। তাদের দেশের এক বড়লোকের বাড়ীতে তাদের আড়াই বছরের মেয়ের খেলার সঙ্গী হ'য়ে যখন সে প্রথম চাকরী করতে ঢোকে তখন তার বয়েস আট বছরের বেশী হবে না। বড়লোকের বাড়ী, চতুর্দিকে কত রকমের সব জিনিষ পড়ে থাকে যা তার চোখে আগে কখনো পড়েনি—ভাঙা চুড়ির ঝক্ঝকে টুক্রো, কাগজের ভাঙা বাক্স, হাত-পা-মাথা ভাঙা মাটির পুতুল, ছেঁড়া রেশমের ও রঙিন কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি মহামূল্য জিনিষ যেখানে যা কুড়িয়ে পেত তাই নিয়ে বাড়ীর এক জায়গায় সে খেলা-ঘর জমিয়ে তুলেছিল। মেয়েটিকে নিয়ে সে এই খেলা-ঘরে গিয়ে বসত। সে খেলতে থাক্ত আর মেয়েটি চুপচাপ বসে একমনে তার কথা শুনত আর খেলা দেখত।

কিছুদিন খেলা দেখতে-দেখতে মেয়েটিরও খেলবার সখ চাপল। তখন সুরু হোলো দু-জনে ঝগড়া। একদিন একটু বাড়াবাড়ি হ'তেই মেয়েটা উঠল কেঁদে, ফলে দু-তিন জন গিন্নি ছুটে এলেন ওপরে। দু-পক্ষের কথা শুনে তাঁরা তার সব জিনিষপত্র টেনে এনে মেয়েটিকে দিয়ে তাকে বললে, এ সব জিনিষ কি তুই তোর বাপের ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলি ?

সে বললে—আমার জিনিষ ফেরত না দিলে আমি কাজ করব না।

তারা বললে—দূর হ'য়ে যা !

এই অবধি বলে সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলত—কিন্তু দূর যে

হওয়া যায় না, তা আমার অন্তরাত্মা জানত। তাই তাদের চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে বাগানের দিকের একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, গরাদ ধরে।

বেলা গড়াতে লাগল। দু-একবার তারা খেতে ডাকলে কিন্তু আমার জিদ—জিনিষ না পেলে কিছুতেই খাব না।

ক্রমে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, চারিদিক্ অন্ধকার থম্‌থম করছে, আমার ভয় করতে লাগল। মনে হোতে লাগল যে, মার কাছে চলে যাই, কিন্তু সেও অনেকখানি অন্ধকার পেরুতে হবে। ভাবছি লাগাই দৌড়—এমন সময়ে বাগানের দিক থেকে কে যেন ডাকলে—শোন।

এত ভয় করছিল তো, কিন্তু আওয়াজটা কানে যেতেই আমার সব ভয় চলে গেল। মুখ ফিরিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দেখি যে জানালা থেকে একটু দূরে এক জন লোক শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাক, মুখ, চোখ কিছুই ভাল ক'রে দেখতে না পেলেও সে যে মানুষ তা বেশ বোঝা যেতে লাগল। আমাকে বলতে লাগল—তুই এ বাড়ির ঝি, ঝিয়ের আবার অভিমান কিসের রে! তোকে জীবন ভোর ঝি-গিরি ক'রে খেতে হবে, এ রকম অভিমান করলে সারা জীবন কষ্ট পাবি।

এই রকম সব অনেক কথা, সব কথা আজ মনে নেই—বলতে বলতে লোকটা শূন্যেই মিলিয়ে গেল।

সে বলত—সেই থেকেই ঠিক করলুম, ভগবান যদি আজকের দিনটা আমার ভালয়-ভালয় কাটিয়ে দেন, তা হোলে আর কখনো অভিমান করব না। তা ভগবান ভালয়-ভালয় কাটিয়ে দিলেন। একটু পরেই সেই মেয়েটির মা এসে আমার জিনিষপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আদর ক'রে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজে সামনে বসে খাওয়ালেন।

সেই কথাগুলো যে আমায় বলেছিল সে নিশ্চয় কোন দেবতা-টেবতা

হবে। কারণ, তার কথাগুলো ঠিক ফলে গেছে—আমাকে সারাজীবন খেটেই খেতে হোলা। স্বামী, পুত্র কেউ আমাকে ভাত দেয়নি। সারা জীবন ধরে আপনার লোক ও পর কত অন্যায় করেছে, অত্যাচার করেছে আমার ওপর, কিন্তু কারুর ওপরে রাগ বা অভিমান করিনি। নিজের বরাতকেই দুষেছি। এই জন্য ভগবান আজও আমাকে অন্নবস্ত্রের দুঃখ দেন-নি।

বাল্যকালে, অনুভূতির অরুণরাগে মানসাকাশ যখন সবে-মাত্র রাঙিয়ে উঠছে, সেই সময় শরতের মার এই কাহিনী সেখানে একখণ্ড কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলেছিল, এত দিন পরে এখানে তার বর্ষণ হ'য়ে গেল।

আবার ছাতে ওঠা যাক্!

ঝি ছাত থেকে নেমে যেতেই বাড়ীর মেয়েরা ছাতে উঠতে আরম্ভ করলে। একসঙ্গে নয়, পরে পরে, যার যখন স্নান শেষ হচ্ছে। আসছে একে-একে—কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, খালি পিঠে ভিজে চুল এলানো। সকলে নিজের শাড়ী প্রভৃতি পরিপাটি ক'রে শুকোতে দিয়ে নেমে গেল।

সে-যুগে বাঙালী পরিবারে ফ্রকের এত বাহুল্য ছিল না। অনেক বাড়ীতে পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েরাও শাড়ী পরত। তার পরে আসতে লাগল কাঁথা, মাদুর সতরঞ্চি, মশারি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কি নয়! ছাতে কাপড় শোকানো দেখে বাড়ীর হাল-চাল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে দিতে পারা যেত।

এর পরে গ্রীষ্মের খর রোদ পোহাতে এল আমসত্ত, আমচুর, জারক লেবু, গুল ইত্যাদির দল। গিন্নিরা যে-যার শয়ন-গৃহে ঢুকে পড়লেন। বাড়ীর মধ্যে সব চাইতে ভাগ্যহীনার ওপরে রইল ছাতের ওপরকার ঐ মহার্ঘ দ্রব্যগুলির তদারকের ভার—শুধু কাক নয়, বাড়ীর ছোটরাও যে তকে-তকে ফিরছে, সে কথা সবাই জানে।

প্রকৃতি দেবী নারীরই স্বজাতি, মধ্যে-মধ্যে বিদ্রোহ করা তাঁর স্বভাব। তাই গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহরকে চমকে দিয়ে হঠাৎ আকাশ কালো ক'রে যেদিন তিনি ঝড় তুলতেন সেদিন লাগত মজা। রাস্তার ধুলো পাক খেয়ে-খেয়ে উঠতে লাগল ঘরে ও ছাতে, দুমদাম্ ক'রে দরজা-জানালা পড়তে লাগল। গিন্নিদের ঘুম ছুটে গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে চোখ খুলেই আকাশের ঐ মূর্ত্তি দেখে ছুটলেন ছাদের সিঁড়ির দিকে—যাবার সময় চিল-চীৎকারে বাড়ী ফাটিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁরা ঘুমের কোলে যে যেমন অবস্থায় ছিলেন, উঠে সেই অবস্থাতেই ছুটলেন ছাতের দিকে—ছোটরাও হুল্লোড়ের এমন সুযোগ পেয়ে ছুটল তাঁদের পিছু-পিছু।

প্রকৃতির বুকে উঠেছে ঝঞ্ঝা আর ছাতে-ছাতে উঠেছে ঝঞ্ঝারূপিণীর ঝাঁক—চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, কাপড় উড়ছে, অর্দ্ধ বিবসনা কিন্তু সেদিকে দৃক্পাতও নেই—ঝড়ের উন্মাদ নর্ত্তনের মাঝে তারা যেন একাকার হ'য়ে গিয়েছে। আমসত্ত বাঁচাতেই হবে—ছোট ছেলেটা কি কারণে আম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আমসত্ত পেলে খায়। অমুকে আমচুর ভালবাসে, তমুকে আম্‌সি ভালবাসে। মিষ্টি আচার ও জারক লেবুকেও ভালবাসবার লোকের অভাব সংসারে নেই। শুকনো কাপড়-গুলো, বিশেষ ক'রে ছোটদের কাপড় ও কাঁথাগুলি বাঁচাতে না পারলে বিকেলের মধ্যেই সংসারচক্র লাইনচ্যুত হবার সম্ভাবনা - বাঁচা বাঁচা, তোল তোল, ছোট ছোট—যাক, সব বেঁচে গেল!

ঐ যা! গুল্‌গুলো, তোলা হয়নি। সে বেচাররা ছাতের এক কোণে পড়ে ভিজতে লাগল। গুল্ খেতে কেউ ভালবাসে না, তাই তার কথা কারুরই মনে পড়ল না।

কবি বলেছেন, গ্রীষ্মের 'দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ'। কথাটা সে যুগের কলকাতার লোকদের বাড়ির ছাত সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বিকেল হবার আগে থাকতেই মেয়েদের চুল বাঁধবার পালা সুরু হোতো। তার পরে কাজ-কর্ম সেরে স্নান ক'রে ধোপদোস্ত, একেবারে ঝক্‌ঝকে হ'য়ে তাঁরা ছাতে উঠতেন, ছোট-বড় কেউ বাদ নয়। কুমারী ও যাদের ছেলেপুলে এখনো হয়নি এমন বৌ-রা সাধারণতঃ কাঁচপোকা বা খয়েরের টিপ পরত। বড়রা টিপ পরতেন না এবং যতদূর মনে পড়ছে, সিঁদুরের টিপ পরার রেওয়াজ সে সময় ছিল না।

এ-ছাত ও-ছাত ও সে-ছাতে সশব্দে আলাপচারী সুরু হ'য়ে গেল। বাড়ীর ছেলেদের এবং কর্তাদের উদ্ভাবিত অথবা সংগ্রহ করা যত সব বাতেল্লা পল্লবিত হ'য়ে শাখা বিস্তার করতে লাগল ছাত থেকে ছাতান্তরে। যে ছাতে পুরুষের কণ্ঠস্বর অবধি পৌঁছয় না—সেই ছাতের সঙ্গেও সশব্দ-ইসারায় আলাপচারী হ'তে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রত্যেকেই প্রত্যেক বাড়ি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়ে গেল—এমন কি ও-বাড়ির সেজো-বৌয়ের মেজ ভাজ ক'মাস গর্ভবতী সে খবরটি পর্য্যন্ত।

এ আড্ডায় বয়সের পার্থক্য এক রকম উপেক্ষাই করা হোতো। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে কর্তারা সব বাড়ি ফিরতে লাগলেন আর মেয়েরাও একে-একে ছাত থেকে নেমে পড়তে আরম্ভ করলেন। অন্ধকার হওয়ায় সঙ্গে-সঙ্গে ছাত হ'য়ে পড়ল ভোঁ-ভোঁ—শুধু এখানে-সেখানে দু-একখানি অভাগিনী শাড়ী আকুল আবেগে বন্ধন-মোচনের চেষ্টা করতে লাগল।

২

ছাতের সঙ্গে আরও কিছু স্মৃতি জীবনকে জড়িয়ে আছে, যা না বললে ছাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা করা হবে। সুখ-স্মৃতি হ'লেও তা অশ্রুময় সুখ-স্মৃতি।

গ্রীষ্মকালে বাড়ীর প্রায় সকলেই, মানে বড়রা, রাত্রে ছাতে শুতেন। ছোটদের ছাতে শোওয়া বারণ ছিল। ছাতে শুতে আমাদের দুই ভাইয়ের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু ইতিপূর্বেই ছোটদের ছাতে শোওয়ার বিরুদ্ধে বাড়ীতে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী হ'য়ে ছিল যে, মনের ইচ্ছাটা সকলের সামনে প্রকাশ করতে সাহসই হোতো না। ছাতে শুলে ছোটদের বিছে, সাপ ও নানা প্রকার বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়াতে পারে, তা ছাড়া ঠাণ্ডা লেগে কি না হ'তে পারে!

সংসারে এত ভাল-ভাল জায়গা থাকতে ঐ কাঁকড়া-বিছে প্রমুখ সাংঘাতিক জীবগুলি ছাতে বাস করেন কেন এবং দংশনবিলাসের ভাল-ভাল উপকরণ ছাতময় এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ ক'রে ছোটদের ওপরে তাঁদের এত আক্রোশের কারণ কি—এ প্রশ্নটা সে সময় খুবই পীড়া দিয়েছিল।

তথাপি একদিন এই বিরুদ্ধ ব্যূহ ভেদ ক'রে মার কাছে মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ ক'রে ফেলা গেল। কিন্তু মা হাঁ কিম্বা না কিছুই না বলায় আমাদের সাহস বেড়ে গেল। দুই ভাই, মাকে একলা পেলেই ছাতে শোবার জন্য বায়না সুরু ক'রে দিলুম। শেষকালে মা-ই আমাদের হ'য়ে

সুপারিশ করায় বাবা আমাদের ছাতে শোওয়া মঞ্জুর করলেন—কিন্তু সব দিন নয়। কেবল মাত্র শনি ও রবিবার রাতে, তবে জামা গায়ে দিয়ে শুতে হবে।

শনিবার আমার জীবন-প্রভাতেই মধুবার রূপে দেখা দিয়েছিল।

ছাতে শোবার আবেদন মঞ্জুর হওয়াতে যে কি রকম খুশী হলুম, তা উল্লেখ করাই বাহুল্য। প্রায় শৈশব থেকেই আমাদের আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নেহাৎ অসুখ-বিসুখ না করলে রাতে মাকে কাছে পেতুম না। ছাতে শোওয়া হবে, আর মার কাছে শোওয়া হবে, এটা কম খুশীর কথা ছিল না সেদিন।

একটা বড় সতরঞ্চির ওপরে পাশাপাশি তিনটে বালিশ। মধ্যে মা শুয়ে, দু-পাশ থেকে আমরা দু-ভাই তাঁকে একান্ত দখল করেছি। বাবা একটু দূরে শুয়ে, আমাদের কণ্ঠস্বরের নাগালের বাইরে—কারণ তাঁর বিছানাটা আমরাই করেছি কি না। আর-আর দু-চার জন, তাঁরাও দূরে-দূরে শুয়ে আছেন।

ছাতে শুয়ে আকাশের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলো। দীপ্ত দ্বিপ্রহরে আমসত্ত বা আচার চুরি করতে উঠে কিংবা দিনের বেলায় কখনো সখনো ঘাড় তুলে যে-আকাশ এত দিন দেখেছি, সে আকাশ আকাশই নয়। চোখের সামনে আলোর আড়াল দিয়ে আকাশ তার আসল রূপ আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল—আকাশের স্বরূপ প্রকাশ হয় রাত্রে।

কোনো আয়াস নেই, চিৎ হয়ে শুয়ে-শুয়ে দেখি চাঁদে আর মেঘে লুকোচুরি খেলা চলেছে। নীল পটে হাল্কা মেঘ দিয়ে ছবি এঁকে চলেছে বাতাস। কত সম্ভব ও অসম্ভব চিত্রলেখা—কিছুক্ষণ দেখতে-দেখতে আত্মহারা হ'য়ে যেতে হয়। তারাদের কথা ভাবতে-ভাবতে কল্পনা হাঁপিয়ে পড়ে—এই রহস্যের আবরণ মা একটু-একটু ক'রে মোচন করতেন।

ঐ যে চাঁদ, ওকে ঘিরে সাতাশটি তারা আছে, তারা সব চাঁদের স্ত্রী—দক্ষ রাজার মেয়ে তারা। দেবতা হোলেও একদিন ওরা আমাদেরই মতন পৃথিবীতে বিচরণ করত। চাঁদের বুকে ঐ কলঙ্কের দাগ কেমন ক'রে হোলো, এম্‌নি কত কাহিনী—কত যুগ-যুগ আগের লোকেরাও চাঁদকে ঠিক এম্‌নিই দেখেছে আজ আমরা যেমনটি দেখ্‌ছি। এখানে আর ওরা আসতে পারে না, আমরাও ওখানে যেতে পারি না, তবুও এইখানকার কত অশ্রু ও বেদনার ইতিহাস ওদের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে। ওরা এই পৃথিবীর লোকের কত কীর্ত্তিই না দেখেছে! ওরা আমাদেরই আপনার লোক, আজ অনেক দূরে চলে গেলে কি হবে, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়নি। ওদের আমরা সব জানি, ওরাও আমাদের সব জানে। ঐ যে জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত তারার দল, ওর নাম সপ্তর্ষি। বশিষ্ঠ ঋষিরা ঐখানে থাকেন। কোন এক রাজার সঙ্গে বশিষ্ঠের বাধল ঝগড়া, তার ফলে ত্রিশঙ্কু বেচারা সপরিবারে ঐখানে আটকে আছেন। কি আর করবেন, ঐখানেই তাঁরা ঘরবাড়ী বানিয়ে নিয়েছেন।

শুনতে-শুনতে রহস্যলোকের অনেক গুপ্তকথাই আমাদের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ত। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে মনে হোতো—আমাদের সঙ্গে তারারাও যেন গল্প শুনছে। আমরা ওদের কথা জানতে পেরেছি দেখে মিট-মিট ক'রে কৌতুক-ভরা হাসি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। দোষ ধরা পড়ে গেলে যেমন ধরা পড়বার ভয় আর থাকে না, থাকে মাত্র একটু লজ্জা, তারার দল তেমনি যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ত আমাদের কাছে। একটু পরেই দুই দলে হ'য়ে যেত ভাব, মনের কথা সুরু হ'য়ে যেত।

মা গল্প বলতেন খুবই আস্তে-আস্তে। গল্প সুরু হবার আগেই আমাদের কল্পনা-ঘোড়া চনমন করতে থাকত ছোটবার জন্য—গল্প আরম্ভ হওয়া-মাত্র আসল কাহিনীকে পেছনে ফেলে সে মাইলের পর মাইল

এগিয়ে ছুট্‌ত। প্রায়ই গল্প পুরো শোনা হোতো না, ঘুম এসে করত বিশ্বাসঘাতকতা—আজ যে ঘুমের প্রতীক্ষায় সারা-রাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয়।

এক দিন, সেদিন ভয়ানক গরম। বাড়ীশুদ্ধ সব কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। খালি-পায়ে রাস্তায় বেরুনো-রূপ অন্যায় কার্যের শাস্তি-স্বরূপ সেই নিমন্ত্রণ-স্বর্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে গৃহারণ্যের একতলা তেতলা ক'রে বেড়াচ্ছি। নিম্নপ্রকৃতি কুলচুর, আমচুর প্রভৃতির সন্ধানে ফিরতে থাকলেও, সংসারে আমি একক, আমার কেউ নেই, আমিও কারুর নই, এই রকম একটা উচ্চ ভাব মনের মধ্যে লালন ক'রে চলেছি বিকেল থেকে! এই ভাবটিকে মনের মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে ছাতে চড়া গেল শোবার উদ্দেশ্যে—যদিও ছাতে শোওয়া সেদিন আমার বারণ ছিল।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। বাড়ীতে কেউ নেই এই ভরসায় বীরদর্পে ছাতে উঠেই চোখে পড়ল, সেখানে বাবা শুয়ে রয়েছেন। নিঃশব্দ ত্বরিতগতিতে একেবারে উল্টোমুখ হ'য়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। বাবা যে সে সময়ে ছাতে শুয়ে আছেন বা তাঁর সেখানে থাকবার সম্ভাবনা আছে, সে কথা আমার কল্পনাতেও ছিল না। যা হোক, উপায় নেই, কাছে যেতেই হোলো।

বাবার ভয়াল গাম্ভীর্য, কঠিন শাসন, সামনে পড়লেই পাঠ্যবিষয়ক অপ্রীতিকর প্রশ্ন, চরিত্র সংশোধনের জন্য তস্মিন্ প্রীতি ও তস্য প্রিয়-কার্য সাধনের উপদেশাবলী—এই সব মাল মশলা মিলিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচিত হ'য়ে উঠেছিল। মোট কথা, তাঁর সান্নিধ্যে এলে আমরা অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করতুম।

কাছে যেতেই বাবা বললেন—এইখানে, আমার পাশে শোও।

বাক্যব্যয় না ক'রে শুয়ে পড়লুম। একটু বাদেই তিনি আদর ক'রে আমার মাথায় হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন। বিকেল থেকে 'সংসারে আমার কেউ নেই' এই ভাব মনের মধ্যে পোষণ ক'রে শুতে এসে বাবার এই আদর—দুই বিপরীত ভাব-তরঙ্গের মাঝখানে পড়ে মন-তরী টাল-মাটাল খেতে সুরু করলে।

বাবা বলতে লাগলেন—আজ সারা বিকেলটা ধরে তোমাকে দেখলুম যে তুমি খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! কেন, তোমার কি চটি নেই?

—আছে।

—তবে? এই এক বছরও এখনো হয়নি, পায়ে ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফুটে কত দিন কষ্ট পেলে! তিন-বার অস্ত্র ক'রে কাঁটা বেরুল না, শেষে অজ্ঞান ক'রে কাঁটা বের করতে হোলো—ভুলে গেছ! সে কষ্ট পেলে শুধু খালি পায়ে ঘোরার অভ্যেসে।

চুপ ক'রে রইলুম। বাবা বলে চল্লেন—শুধু কি তুমিই কষ্ট পেলে? তোমার সেই কষ্ট দেখে আমি কি কম কষ্ট পেয়েছি! তোমার পায়ে এক-এক বার অস্ত্র করা হয়েছে, আর চিন্তায় ও কষ্টে দু-তিন রাত্রি ধরে আমি ঘুমুতে পারিনি, আপিসেও কাজ করতে পারিনি। তুমি বড় হচ্ছ, এ-সব তোমার বোঝা উচিত।

এমন করুণ ও স্নেহের সুর বাবার কণ্ঠে এর আগে আর শুনিনি—বাধার প্রাচীর ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। বাবা বল্লেন—প্রতিজ্ঞা কর যে আজ থেকে আর কখনো খালি পায়ে ঘোরা-ফেরা করব না।

সেদিনের বাবার দেওয়া দেড় টাকা মূল্যের জুতো জোড়া আজ নিজের পয়সায় পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনতে হবে এমন দুরদৃষ্টের কথা শুধু আমি কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন বালকেরই কল্পনায় আসেনি, তাই প্রতিজ্ঞাটা টপ্ ক'রেই ফেলেছিলুম। সেই কথা মনে হচ্ছে আর ভাবছি, বাবা এখন থাকলে কি সুবিধেটাই না হোতো?

জুতার পাট শেষ ক'রেই তিনি কাজের কথা পাড়লেন—আচ্ছা এ যে আকাশ দেখছ, এর শেষ কোথায় বল তো ?

বললুম—এর শেষ নেই, আকাশ অসীম।

শৈশব থেকেই অসীম, অনাদি, অনন্ত, অখিল ইত্যাদি কথাগুলো সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—কথাটা ভাল মতন লাগাতে পেরে বেশ খুশী হ'য়ে উঠলুম।

বাবা আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বল তো, এই আকাশ কে তৈরী করেছে ?

বললুম—ভগবান।

উপরি-উপরি তত্ত্ববিষ্ঠার এই রকম দু-টি দুরূহ প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর পেয়ে বাবা দস্তুরমতন উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, ভগবান কোথায় থাকেন বল তো ?

খুব ছেলেবেলা থেকে রাত্রে ঘুমোবার আগে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় খাবার আগে আমরা চোখ বুজে হাত-জোড় ক'রে প্রার্থনা করতুম। খাবার ও শোবার পূর্ব্বের প্রার্থনার ভিন্ন-ভিন্ন বয়েৎ বাবাই আমাদের শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া, অন্যায় কাজ ক'রে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য, না-পড়ে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য, কড়া মাষ্টারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, জাগ্রত অবস্থায় প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই ভগবানের নাম জপ করতে থাকলেও তাঁর বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার কৌতূহলই কখনো হয়নি—কাজেই এবারকার প্রশ্নে কাৎই হলুম।

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষই চুপ-চাপ। শেষকালে আমিই উল্টে প্রশ্ন করলুম—ভগবান কোথায় থাকেন বাবা ?

—তিনি সব জায়গাতে সব সময়েই থাকেন।

—তাঁকে দেখা যায় না কেন বাবা ?

—যারা তাঁকে দেখতে চায় তারা দেখতে পায়। তুমি ধ্রুবর গল্প জানো তো? ধ্রুব তাঁকে দেখবার জন্য কত কষ্ট করেছিলেন—শেষকালে ভগবান তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বল্‌লেন—সাধু লোককে ভগবান দেখা দেন।

—আচ্ছা বাবা, তাঁকে চিঠি লেখা যায় না?

—না।

—তিনি কারুকে চিঠি লেখেন?

—হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের জন্যই চিঠি লিখে রেখেছেন—ফুলে, ফলে, গাছের পাতায়, কত জায়গায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে রয়েছে—সাধু লোকেরা সে-সব লেখা পড়তে পারেন।

বাবা বলতে লাগলেন—আমরা ঐ যে আকাশ দেখতে পাচ্ছি—ঐ যে তারা-ভরা আকাশ, ওখানেও কত কথা লেখা আছে!

বল্লুম—কৈ, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না বাবা?

বাবা বল্লেন—মনে কর, আকাশটা যেন একখানা বিরাট শ্লেট্—তার ওপরে তিনি জ্যোতির অক্ষরে ঐ সব লেখা লিখে রেখেছেন—কায়মনে চেষ্টা করলে বুঝতে পারা যায়, তিনি কি বলছেন।

আমরা বুঝতে পারি না বাবা?

এবার তিনি নিবিড়ভাবে আমার আদর করতে-করতে ধরা-ধরা গলায় বললেন—তুমি যখন বড় হবে বাবা, তখন চেষ্টা কোরো, ঠিক বুঝতে পারবে।

বাবা আরও অনেক কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু সে-সব আর আমার কানে গেল না। ঐ কালো শ্লেটে আলোর অক্ষরে চিঠির কথাই কেবল মনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে গুঞ্জরণ করতে লাগল।

সেই থেকে, সেই সুদূর অতীতে, বাল্যকালের বিস্মৃতপ্রায় এক

রাত্রির অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে যে আকর্ষণে আমি বাঁধা পড়েছিলুম, সে বন্ধন আজও অটুট আছে। সারা জীবন ধরে, সুখে, দুঃখে, শোকে ও ভোগে সর্ব অবস্থায় আকাশ আমাকে টেনেছে তার কাছে—ভোগের অজস্র উপাদানের মধ্যে আত্মহারা হ'য়ে সমাজ, সংস্কার ও সময়ের থেই হারিয়ে ফেলেছি, তারই মধ্যে আহ্বান পাঠিয়েছে আমাকে সেই কালো শ্লেটে আঁকা জ্যোতির অক্ষর। উন্মাদনা ঝেড়ে ফেলে ছুটে গিয়ে বসেছি তার নীচে। কত দিন আকাশের দিকে দেখতে-দেখতে মনে হয়েছে, ঐ সুনীল রহস্যের যবনিকা এইবার বোধ হয় খসে পড়ল—ঐ জ্যোতির ইঙ্গিত এতদিনে বুঝি বা ধরা দেয়! কিন্তু হায়! বারে বারে আমারই মানসাকাশ আত্ম-অভিমানের মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে, আর সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশের চেয়ে বড় আকর্ষণ আমার আর নেই।

রাতে

আজকাল শহর বড় হয়েছে, লোকজন গাড়ী অনেক বেড়েছে, রাস্তায় বেরুলে মনে হয় যেন রথের মেলায় ঢুকে পড়েছি। শহরের অনেক পরিবর্ত্তন হ'লেও বাঙালী-চরিত্রের একটা দিকের পরিবর্ত্তন হয়েছে খুবই কম। অর্থাৎ কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরলে তারা আর গর্ত্ত ছেড়ে বেরুতে চায় না। সাধারণতঃ বাঙালীর জীবন তার চাকরী-ব্যবসা-কাজকর্ম অর্থাৎ অর্থ অন্বেষণ ও সংসার, এই নিয়ে। মুখে যাই বলুক না কেন, কার্য্যতঃ অধিকাংশ লোকই এই গণ্ডির বাইরে পা দিতে চায় না। প্রায় প্রত্যেক বাঙালীই অবাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না এবং নিজের ক্ষেত্রের বাইরে অন্য আড্ডায় গিয়ে পড়লে সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। এই দোষ থেকে আজকাল অনেকে মুক্ত হ'লেও আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে প্রায় প্রত্যেক বাঙালী সম্বন্ধেই এই কথা বলা যেতে পারত।

হিন্দু-মুসলমানে প্রেমভাব বৃদ্ধি পাবার তালে-তালে দেখ্ দেখ্ ক'রে শহরে হিন্দুদের মধ্যে লুঙ্গি ও মুরগীর প্রভাব আজ যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আগে তা ছিল না।

কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে বা স্নান ক'রে অনেকেই একখানি আটহাতি ধুতি পরতেন। চোদ্দ হাত ধুতিতে লজ্জা নিবারণ হয় না, এমন সব শ্রীঅঙ্গে যখন সেই আটহাতি ধুতি চড়ত, তখন যে কি বাহার হোতো তা বলাই বাহুল্য—গো-হত্যার গন্ধ থাকলেও তার তুলনায় লুঙ্গিও ঢের সভ্য। এর পরে অবস্থা নির্ব্বিশেষে যায় যেমন জুটস,

যেমন জলযোগ ক'রে কেউ বা বাড়ীতেই ছেলে ঠেঙাতে বসতেন আর কেউ বা হুঁকো হাতে, কেউ বা খালি হাতেই পাড়াতেই আড্ডা দিতে বেরুতেন। এই ছিল সাধারণ লোকের নিয়ম।

পথ জনবিরল হ'য়ে পড়ার সঙ্গে পথের দু-ধারে বাড়ীগুলোর রকে আড্ডা জমাট হোতো। প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই এইরকম দুটো-তিনটে রক থাকৃত যেখানে পাড়ার মুরুব্বীরা সন্ধ্যের পর গিয়ে জমতেন—বে-পাড়া থেকেও কেউ-কেউ আসতেন। বর্ষা ও শীতের দিনে ঘরের মধ্যে বসা হোতো আর অন্য সময়ে রকে মাদুর কিংবা শতরঞ্চি পেতে বসা হোতো, সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ ক'রে সেই সাড়ে ন-টার তোপ পড়া পর্য্যন্ত।

সাড়ে ন-টার তোপ কলকাতাবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সাড়ে ন-টার তোপ ছাড়াও সে যুগে ঠিক ঐ সময় পোর্ট কমিশনারের ভোঁ বাজত প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। অনেকদিন আগেই কলকাতা তার এই সম্পদ দু-টি হারিয়েছিল, আজ সে নিজস্ব সময়টুকুও হারিয়েছে।

সে যুগে সাড়ে ন-টার তোপ পড়ার সঙ্গে থিয়েটার, সার্কাস প্রভৃতি আরম্ভ হোতো। আবগারী দোকান বন্ধ হোতো (অবশ্য সামনের দরজা) সাড়ে ন-টায়, ছেলেরা পড়া থেকে ত্রাণ পেত, বাবুদের আড্ডা ভাঙত, এ রকম কত কি!

রাতের ফেরিওয়ালারা সব সৌখিন জিনিষ নিয়ে বেরুতো—কুলপী বরফ, জামাইতত্ত্ব লেডিকেনি, জুঁয়ের গোড়ে, বেলের মালা এই রকম সব জিনিষ। রাতে এক রকম অবাক জলপানওয়ালা আসত, তারা নানা রকম মজার কবিতা আবৃত্তি করত, কেউ কেউ গানও করত। বাবুদের আড্ডায় এদের খুবই পশার ছিল। আধুনিক যুগে অবিশ্যি অবাক জলপানওয়ালারা পায়ে ঘুমুর বেঁধে নেচে গান গায়—ফেরী করা সম্বন্ধে তারা অনেক উন্নত পন্থা অবলম্বন করেছে।

প্রায় এই সব আড্ডায় নিজেদের মধ্যে আপোষে তর্কাতর্কি হ'তে-হ'তে এমন ঝগড়া ও গালাগালি সুরু হোতো যে বাড়ীর-মধ্যেরা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠতেন—একটা মারামারি খুনোখুনি হয় বুঝি ! কিন্তু তখনকার লোকদের আড্ডার প্রতি এমন নিষ্ঠা ছিল যে, হাজার ঝগড়া হ'লেও পরদিন সন্ধ্যেবেলায় আবার গুটি-গুটি আড্ডায় গিয়ে বসা চাই। এর চাইতে অনেক কম ঝগড়াতেও ভাইয়ে-ভাইয়ে ভিন্ন হ'য়ে যেতে দেখা যেত।

সেকেলে রাত্রিবেলা বহুরূপী বেরুতো নানা রকম সাজে সেজে। কালীমূর্ত্তি বহুরূপীর কথা মনে হ'লে আজও শিউরে উঠতে হয়। লোকটা গেঞ্জির underwear কালো রংয়ে ছুপিয়ে পরে দুই পায়ে ঘুমুর চড়াতো। দু-টো খুব লম্বা-লম্বা ফাঁপা টিনের হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথায় কালী ঠাকুরের টিনের মুখোস পরে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে যখন খল-খল ক'রে হাসতে আরম্ভ করত, তখন ছোটদের দল, তা যে যতই ওস্তাদ হোক না কেন, দৌড় দিত অন্দরমহলের দিকে।

বহুরূপীদের বেশ খাতিরও ছিল পাড়ায়। তারা যে মানুষ, অন্য কোন জীব নয়, এ জ্ঞান টনটনে থাকলেও কি জানি তবুও মনে হোতো তারা ঠিক আমাদের মতন নয়। প্রতিদিন কালী সেজে-সেজে তারা কালী ঠাকুরের অনেকখানি অন্তরঙ্গ হ'য়ে পড়েছে বলে মনে হোতো। গলায় টিনের নরমুণ্ডের মালা ঝুলছে বুঝতে পারলেও বুদ্ধিকে কল্পনার ধোঁকা লাগাতুম—আসলে ওগুলো সত্যিকারেরই নরমুণ্ড, তবে মা কালীর প্রভাবে ওগুলো লোকের মনে হয় যেন টিনের। আমরা মনে করতুম, ওরা লুকিয়ে নরমুণ্ড খায় ও নররক্ত পান করে। অমাবস্যার গভীর রাত্রে কালী ঠাকুর নিজে আসেন ওদের কাছে পূজো নেবার জন্য। লোকের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালে কিছু দিতেই হবে, নইলে শাপ-মন্যি ঝেড়ে দিলে 'একদম্‌সে গেচিস্‌' হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে !

ঠাকুর মার্কা বহুরূপীদের সম্বন্ধে এই রকম সব অতিপ্রাকৃত ধারণা-গুলোকে কল্পনার বাতাস দিয়ে আমরা খুবই উঁচুতে তুলে রেখেছিলুম, এমন সময় এক দিনের একটা ঘটনায় সব উড়ে গেল।

এক দিন, সেদিন নিশ্চয় শনিবার কিংবা কোন ছুটির দিন ছিল। নইলে সে সময় পাঠাগার ছেড়ে নীচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সন্ধ্যে উৎরে যাবার কিছু পরে আমাদের সদর দরজা খোলা পেয়ে ঝম্-ঝম্ আওয়াজ করতে-করতে কালীমূর্ত্তি একেবারে উঠোনে এসে হাজির হোলো। তার পিছনে রকের আড্ডা থেকে জন কয়েক উঠে এলেন। ভিড় বাড়ছে দেখে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হোলো।

বহুরূপী খানিকক্ষণ অট্টহাসি হাসলে, তার পর ভয় দেখাবার জন্য দু-একবার আমাদের দিকে তেড়ে এল। এতক্ষণ চলছিল বেশ কিন্তু হঠাৎ সে মাথার ওপর থেকে সেই দাঁত ও লম্বা জিভ বার-করা প্রকাণ্ড মুখোশটা খুলে ফেল্লে।

এঃ, এ যে একেবারে আমাদের মতনই। এক মুরুব্বী ভদ্রলোক ভড়াক-ভড়াক ক'রে তামাক টেনে চলেছিলেন, বহুরূপী ঝম্-ঝম্ ক'রে সেদিকে এগিয়ে সেই লম্বা টিনের হাত একেবারে তাঁর নাকের ডগা অবধি বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—বাবু, কলকেটা দয়া ক'রে একটু দেবেন ?

আচম্‌কা নাকের ডগায় কালীর হাত দেখে—হোক্ না সে টিনের কালী—কিসে যে কি হয়, তা কে বলতে পারে !—ভদ্রলোক ভড়কে গিয়ে হুঁকো-হাতে তিন পা পিছিয়ে গেলেন।

একটা হাসাহাসি পড়ে গেল। ভদ্রলোক সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে এক রকম কাঁপতে-কাঁপতেই হুঁকোর মাথা থেকে কল্‌কেটা তুলে নিয়ে সেই টিনের হাতের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

বহুরূপী টপ্-টপ্ ক'রে দু-হাতের খোলোশ খুলে মাটিতে নামিয়ে

রেখে কলকেটা নিয়ে উবু হ'য়ে বসে দশ আঙুল দিয়ে সেটাকে সাপটে ধরে ফক্-ফক্ ক'রে টানতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আর এক জন, তাঁরও হাতে থেলো হুঁকো, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার দেশ কোথায় গা?

বহুরূপী সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কলকেটা নামিয়ে ধরে আগুনে খুব জোরে ফুঁ দিতে লাগল। তার পরে আবার গোটা কয়েক টান মেরে বল্লে—নাঃ, এতে কিছু নেই—নিন্ ঠাকুর, আপনার কল্‌কে—

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোক খালি গায়েই এসেছিলেন। তখনকার দিনে মধ্যবিত্তের ঘরে দিবা-রাত্রি জামা টন্‌কে থাকবার রেওয়াজ ছিল না। গ্রীষ্মের দিনে বাড়ীতে তো বটেই, পাড়ায় বেরুতে হ'লেও লোকে খালি গায়েই বেরুত।

ভদ্রলোক নিজের হুঁকোর মাথায় কলকেটা বসাচ্ছেন এমন সময় বহুরূপী বল্লে—সাধে কি আর বলে—বামুন-চোষা কল্‌কে!

কথাটা শুনে সভায় একেবারে হর্‌রা উঠে গেল। মেয়েরা ছিলেন আড়ালে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকেও চাপা হাসির দু-চারটে টুক্‌রো ছিটকে এল। ভদ্রলোক বিলক্ষণ চটে গিয়ে কি প্যাঁচে বহুরূপীকে কাৎ করা যায়, গুম্ হ'য়ে তাই ভাবতে লাগলেন।

বহুরূপী কিন্তু নির্বিকার হ'য়ে অন্য দিকে ফিরে যে ভদ্রলোক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁকে বল্লে—দিন বাবু আপনার কল্‌কেটা।

ভদ্রলোক কলকেটা তুলে তার হাতে দিতেই সে আবার সেই রকম উবু হ'য়ে বসে সাঁই-সাঁই ক'রে দম লাগাতে লাগল—সভা হ'য়ে গেল একেবারে নিস্তব্ধ। আমরা ছেলে-বুড়ো সবাই হাঁ ক'রে তার কল্‌কে-টানা দেখতে লাগলুম, সকলেই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম—এবার কি হয়!

মিনিটখানেক বাদে কলকেটা নামিয়ে মুখের সাম্‌নেকার মেঘ তাড়াতে-তাড়াতে বহুরূপী বললে—হ্যাঁ বাবু, জিজ্ঞাসা করছিলেন দেশ কোথায়? দেশ আমাদের নদে জেলায়।

আগেকার ভদ্রলোক ততক্ষণে সামলে উঠে বহুরূপীকে বোধহয় একেবারে পেড়ে ফেলবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি জাত হে?

যার কল্‌কে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বহুরূপী বিনীতভাবে তাঁকে বললে—আজ্ঞে, আমরা জাতে ছুতোর।

ভদ্রলোক বেশ উৎফুল্ল হ'য়ে আবার একটি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন—তা বাপু, ছুতোরের ছেলে হ'য়ে জাত-ব্যবসা ছেড়ে এ উঞ্ছবৃত্তি করছ কেন?

বহুরূপী বেশ বিজ্ঞের মতন জবাব দিলে—জাত-ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু করা যদি উঞ্ছবৃত্তি হয়, তা হ'লে তো ঠগ বাছতে গাঁ ওজোড় হয়ে যাবে ঠাকুর। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি কি জাত-ব্যবসা করেন, না উঞ্ছবৃত্তিই ক'রে থাকেন আমার মতন?

সেখানে আরও দু-চার জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, কথাটা তাঁরা রঙ্গচ্ছলে গ্রহণ করতে পারলেন না। কেউ-কেউ দু-একটা মন্তব্যও ছাড়তে লাগলেন। একজন বললেন—বলি ওহে, কথা তো খুব বলতে পার দেখছি, গান-টান গাইতে পার?

বহুরূপী একেবারে বিনয়ের অবতার হ'য়ে বললে—একটু-আধটু পারি বৈ কি! পয়সা পেলেই গাই।

গানের হুকুম হোলো। বহুরূপী একটু ঘুহু-ঘুহু আওয়াজ ক'রে গলা ভেঁজে নিয়ে গান ধরলে—'শ্মশান ভালবাসিস্ বলে শ্মশান করেছি হৃদি।'

পুরানো গান কিন্তু বহুরূপী ছিল সুকণ্ঠ—গানটা ভাবের সঙ্গে দু-তিন বার গেয়ে-গেয়ে সে থাম্‌ল। অত্যন্ত কষ্টকর আবহাওয়ার মধ্যে যেন মেঘবর্ষণ হোলো। তার বাক্যবাণে যাঁরা রাগ করেছিলেন তাদের উষ্মা কেটে গেল। দু-এক জনের চক্ষু লোক-দেখানো জলে ভরে উঠল।

পাড়ার জন-দুয়েক নামজাদা কালীভক্ত পুজোর দেরী হ'য়ে যাচ্ছে দেখে বেরিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করতে আরম্ভ করলেন, ইতিমধ্যে আবার গানের ফরমাশ সুরু হোলো।

এক জন রসিকতা করলেন—হ্যাঁ হে, নাচতে পার?

বহুরূপী হাত জোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে না।

আর এক জন বললেন—নাচ না হে, লজ্জা কি! পায়ে ঘুমুর বেঁধেছ আর নাচতে জান না? একি একটা কথা হোলো!

বহুরূপী আবার সেই রকম হাতজোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে, আমি নিজের ইচ্ছায় নাচি না—তবে আপনারা যখন বলছেন তখন নাচতেই হবে! বিদায়ের সময় ভুলবেন না।

সকলে মিলে বহুরূপীকে উৎসাহ দিতে লাগলেন—নাচো, নাচো—কোন ভয় নেই।

সবার কথায় বহুরূপী তার নাচ সুরু করলে।

বাপ্‌ রে, সে কি নাচ! কি লম্ফ কি ঝম্ফ! বাড়ীর ও বাইরের যত লোক ছিল সেখানে—ছেলে-বুড়ো কারুর মুখে আর বাক্যি নেই! আর সে নাচের কি শেষ আছে! থেকে-থেকে ভীষণ হুঙ্কার ছেড়ে মাটি ছেড়ে হাত-দুয়েক শূন্যে লাফিয়ে উঠে এক পায়ে হাঁটু গেড়ে বসা, খাঁড়া দিয়ে অসুর বধ করা, যুদ্ধ করা, অসুর ধরে-ধরে খাওয়া—দেখতে দেখতে আমরা হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম আর মনে হোতে লাগল, ধরে না থামালে বোধ হয় আমাদের জীবনভোর এই রকম দাঁড়িয়ে নাচই দেখতে হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই রকম নেচে বহুরূপী এলিয়ে পড়ল।

যা হোক, নাচ শেষ হোলো, সকলে চুপচাপ, এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, এমন সময় বহুরূপীই বললে—বাবু, এবার আমায় বিদায় দান।

সকলের টনক নড়ল, বহুরূপী বেশ কিছু হাতিয়ে নিয়ে আবার আসবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল।

বহুরূপী চলে যেতেই তার নাচ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'য়ে গেল। কেউ বললে—ব্যাটা আমাদের খুব বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল।

কেউ বললে—বাপের জন্মে এমন নাচ দেখিনি।

বৃদ্ধ অক্রুরবাবু এক জয়গায় বসে ঝিমোচ্ছিলেন, এক জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—অক্রুরদা কি বলেন?

অক্রুরবাবু ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের লোক। দিন-রাত্রি তিনি আফিংয়ের মৌজে ভোম্ হ'য়ে থাকতেন—বিশেষ ক'রে সন্ধ্যার পর তিনি আর চোখ চাইতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই চোখ-বন্ধ অবস্থাতেই তিনি পাড়াময় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আর একটি আশ্চর্য্য গুণ ছিল, তিনি চলতে-চলতে, বাজার করতে-করতে, কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন। আমরা দেখেছি, অক্রুরবাবু মুদীর দোকান থেকে সওদা ক'রে ঠোঙা কিংবা ঝিয়ের বাটি হাতে নিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দিব্যি ঘুম লাগাচ্ছেন। পাড়ার ছোট-বড় সবার বাড়ীতেই আনন্দ-উৎসব, সুখ-দুঃখ-শোকের সময় অক্রুর বাবু যেতেন আর গিয়েই লাগাতেন ঘুম। সন্ধ্যার পর পাড়ার যত আড্ডা ও লোকের বাড়ী ঘুমিয়ে বেড়ানই ছিল তাঁর কাজ। অথচ তিনি দুঃখ করতেন, বিছানায় বালিশ মাথায় দিয়ে সুখে ঘুম তাঁর হয় না, সারারাত্রি জেগেই কাটাতে হয়। সবার ওপরে অক্রুরবাবু ছিলেন সবজান্তা। দিবানিশি ঘুমিয়ে এত জ্ঞান তিনি সংগ্রহ করলেন কি ক'রে, তা পাড়ার সবার একটা গবেষণার বিষয় ছিল।

এ-হেন অক্রুরবাবু এক পাশে বসেছিলেন অর্থাৎ ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি চোখ বুজেই বললেন—না হে, ওকে

একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এর মধ্যে জিনিস আছে। একে বলে তাণ্ডব নাচ।

সবার যেন একটা হদিশ গেল। তাণ্ডব সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'য়ে গেল। সে সম্বন্ধে যার যা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তা আউড়ে যেতে লাগলেন। এক জন বেশ ফলাও ক'রে বললেন—আরে বাবা, আসল তাণ্ডব কি দেখতে পারা যায়! সবার চোখ তা সহ্য করতে পারে না। অনেক সাধনা করলে তবে সে নাচ দেখবার শক্তি হয়। সবার চোখে সব নাচ সহ্য হয় না!

জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, ভদ্রলোক সেদিন একটা মহা সত্যই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে, অনেক নাচই আমার চোখে অখাদ্য বলে মনে হয়েছে কিন্তু অন্যে তা উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে। এই বৈষম্যের কারণ যা শুনেছি, তা এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে ঐ কথাই বলতে হয়—সে নাচ বোঝবার মতন শক্তি আমার নেই।

আর এক জন ভদ্রলোক বললেন—থিয়েটারের নাচ কি আবার নাচ না কি? আসল নাচ হচ্ছে এই, তবে ব্যাটা ঠিক মত নাচতে পারলে না?

বাল্যাবস্থায় একবার থিয়েটার দেখেছিলুম। জীবনে সেই প্রথম দেখলুম নাচ। পরীর মত দেখতে সখীদের সেই চক্কর মেরে নাচ—ওঃ, সে যে কি ভালোই লেগেছিল, কি বলব! ভবিষ্যতে নৃত্যকলাটিকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হবে, এমন বাসনাও মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল এবং থিয়েটারের সেই নাচই ছিল আদর্শ। কিন্তু সেদিন যখন শুনলুম, থিয়েটারের সেই নাচ নাচ-নামেরই যোগ্য নয় এবং এই তিড়িং-মারাই হচ্ছে আসল নাচ, সেদিন বিচলিতই হয়েছিলুম। যাই হোক, সেই রাত্রেই বিছানায় শুয়ে সংকল্প করা গেল—কুচ পরোয়া নেই, ঐ তিড়িংমারা নাচই শিখতে হবে।

কিন্তু বিধাতা যাকে প্রতিভা দেন অথচ সেই অনুপাতে অর্থানুকূল্য করেন না, সে দুর্ভাগার দুনিয়ায় দুর্গতির আর সীমা থাকে না। তাই নাচ না শিখেও সারাজীন ধরে নেচেই বেড়াতে হোলো—কখনো তাণ্ডব, কখনো কথক, কখনো বা কথাকলি তবে—সেই বহুরূপীরই মতন নিজের ইচ্ছায় নয়, পরের কথায়।

মুশকিল আশান

একদিন মার কাছে মুশকিল-আশানের নামটা শুনলুম। মুশকিল আশান কথাটার মধ্যে কেমন-যেন একটা চমক আছে। মুশকিল আশান দেবতার নাম! সেই দেবতাকে যারা পূজো করে, সেই সব সন্ন্যেসীরা রাত্রি-বেলা বের হয়—লোকের কাছে মুশকিল-আশানের নাম শোনাতে। লোকের কাছে তারাও মুশকিল-আশান বলে পরিচিত। এ-পাড়াতেও একজন মুশকিল-আশান আসে মাঝে-মাঝে অনেক রাতে। সে না কি আবার সবার বাড়ীতে যায় না! মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসে মুশকিল-আশানের নাম শুনিয়ে যায়, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি।

অনেক রাতে, রাস্তায় লোক-জন চলা যখন একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়, সেই নিশুতিতে অন্ধকার অলি-গলিতে বাতি হাতে নিয়ে লোকের দরজায় দাঁড়িয়ে মুশকিল-আশানের নাম করে—বিপদকে তারা ডরায় না, কারণ তারা মুশকিল-আশানের পুজারী।

মার কাছে আরও শুনে অবকে হ'য়ে গেলুম যে, এই মুশকিল আশানেরা হিন্দু নয়, তারা মুসলমান সন্ন্যাসী অর্থাৎ ফকির। তারা মাথায় লম্বা চুল রাখে বটে কিন্তু জটা করে না। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতন তারা ল্যাঙট পরে না, তারা পরে আলখাল্লার মতন একটা জিনিষ, যাকে ওরা কফ্‌নি বলে।

মার মুখে শুনে মুশকিল-আশানের একটা ছবি মনের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে দেখবার ইচ্ছাও প্রবল হ'তে লাগল।

কিন্তু সে কি ক'রে সম্ভব হবে—সে আসে অনেক রাত্রে, এদিকে সাড়ে নটা বাজতে না বাজতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি যে!

আর এক দিন মার কাছে শুনলুম—কাল রাতে মুশকিল-আশান এসেছিল, আস্‌চে শুক্রবারে আবার আস্‌বে, বলে রেখেছি তাকে তোদের দেখাব।

অনেক কষ্টে আশার শুক্রবার এসে পৌঁছল। সে রাত্রে আমরা মার কাছে শুলুম। অনেক রাতে, অর্থাৎ তখন আমরা অঘোরে ঘুমুচ্ছি, মা ডেকে তুলে বল্লেন—চল, মুশকিল-আশান এসেছে।

মার হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, আমরা ঘুমের ঘোরে টলতে-টলতে চললুম তাঁর পেছনে-পেছনে—রাত দুপুরে বাড়ীর সব জায়গাগুলোই যেন অপরিচিতের মতন ব্যবহার করে, তাই দু-একটা ঠোক্করও খেতে হল। দু-টো উঁচু-নীচু ছাত, সিঁড়ি, দুটো উঠোন পেরিয়ে আমাদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গিয়ে মা সদর দরজার হুড়কো খুলে দিলেন।

প্রথমেই বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌ল খানিকটা ধোঁয়া। তার পেছনে অদ্ভুত পোষাক-পরা, অদ্ভুত প্রদীপ হাতে নিয়ে ঢুক্‌ল এক অদ্ভুত চেহারার মানুষ!

আমাদের দুই ভাইকে সামনে রেখে মা পিছনে এসে দাঁড়ালেন। মুশকিল-আশান এক-পা ক'রে এগিয়ে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল—আমরাও সেই তালে পেছোতে-পেছোতে একেবারে মার গা-সাঁট্টা হ'য়ে গেলুম।

সম্ভ্রম, বিস্ময় ও ভয়-মিশ্রিত এক বিচিত্র পুলকে আমরা দেখতে লাগলুম সেই মুশকিল-আশানকে।

মাথায় তার লম্বা বাবরী, বেশ পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো। মুখে যেমন লম্বা তেমনি ঘন কাঁচা-পাকা দাড়ি—চোখ দু-টো ছাড়া মুখের আর কিছুই দেখা যায় না। নাকের ওপরেও ইয়া লম্বা-লম্বা রোঁয়া জিজ্ঞাসার

চিহ্নের মতন উল্কত হ'য়ে রয়েছে। অঙ্গে একটা ময়লা আলখাল্লা হাঁটু ছাড়িয়া একটু নেমেছে, পায়ের বাকী অংশটা নগ্ন। আলখাল্লার গায়ে বড়-বড় কয়েকটা রঙিন কাপড়ের তালি! গলায় বড়-বড় শাদা ও নীল পুঁতির লম্বা মালা ঝুলেছে, সেই রকমই আর একগাছা মালা বাঁ-হাতের কব্জীতে ঝুলছে। ডান হাতে অদ্ভুত এক দীপ—যেন ছোট একখানা কাঁসিতে বড় একটা ঘটি উপুড় করা। তা থেকে বদ্‌নার মতন দু-টো নল দু-দিক দিয়ে বেরিয়েছে, তার একটাতে ইয়া মোটা পলতে জ্বলছে দাউ-দাউ ক'রে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই খোলা উঠোন ধোঁয়া ও কেরাসিনের গন্ধে ভরপুর হ'য়ে গেল। কাঁসার থালি স্থানটুকুতে তেল-কালি ও পয়সা মাখামাখি হ'য়ে পড়ে আছে।

বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় আমাদের চম্‌কে দিয়ে মুশকিল আশান সুর ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল—ইহা পীর মুশকিল-আশান—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান। তারপরে গড়-গড় ক'রে আরও কতকগুলো কি আউড়ে গেল বুঝতে পারলুম না।

মা তাকে বল্‌লেন—বাবা, আমার এই* ছেলে দু-টো বড্ড দুরন্ত—মুশকিল-আশানের কাছে একটু মিনতি কোরো এদের জন্যে।

মুশকিল-আশান আমাদের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার চাইলে। বুকের মধ্যে গুম্‌-গুম্‌ করতে আরম্ভ করল। তারপর চোখ দু-টো আকাশমুখো ক'রে কি যেন দেখতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের চোখও উঠল ওপর দিকে, কিন্তু সেখানে ফাঁকা আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

প্রায় আধ মিনিট কাল সেই উৎকণ্ঠায় কাটবার পর মুশকিল-আশান খুব মিষ্টি সুরে বল্‌লে—মা, ছেলে-পুলে একটু দুষ্টু-দুরন্ত হ'য়েই থাকে—সব ঠিক হ'য়ে যাবে, কিছু ভাববেন না।

মা বল্‌লেন—সে রকম নয়, তা হোলে আর ভাবনা কিসের! এই বলে আমাকে দেখিয়া দিয়ে বল্‌লেন—এই ছেলেটা এরি মধ্যে একবার

তেতলার ছাত থেকে পড়েছে আর একবার জলে ডুবেছে—এখনো তো সারা জীবনই পড়ে আছে।

এই অবধি বলে আমার ছোট ভাইকে দেখিয়ে আবার বল্লেন—এটা ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু এটাকেও হুড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এ হেন চিজটিকে মুশকিল-আশান মশায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর মা বল্লেন—এদের জন্যে দিনে-রাতে শান্তি পাই নে বাবা!

মাতৃকণ্ঠের সেই কাতর আকুলতা দেবতাকে স্পর্শ করেছিল কিনা জানি না, কিন্তু শিশু-হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তখুনি সংকল্প ক'রে ফেললুম—মার মনে কষ্ট দোবো না—মায়ের অবাধ্য হব না।

এই সংকল্প জীবনে অসংখ্যবার করেছি এবং অসংখ্যবারই সংকল্পচ্যুত হয়েছি।

মুশকিল-আশান আশ্বাস দিয়ে বললে—কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে মা। মুশকিল আশান ভালই করবেন।

মা আঁচলের গেরো খুলে আমাদের দুই ভাইয়ের হাতে একটা ক'রে পয়সা দিলেন। আমরা তার সেই তেল-কালি-মাখানো কাঁসিতে পয়সা দু-টো ফেলে দিতেই মুশকিল-আশান আবার চেঁচিয়ে উঠল—ইয়া পীর—

তারপরে একটু তেল কালি তুলে আমাদের কপালে একটা ক'রে টিপ লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মার সঙ্গে ঘরে ফিরে এসে তাঁর পাশেই শুয়ে পড়লুম। দিনান্তের পারে দাঁড়িয়ে আজ মনে হচ্ছে, সেদিনটা আমার শুভই ছিল। জীবন্ত মুশকিল-আশানের পাশে শুয়ে দূরাগত মুশকিল-আশানের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—এমন দিন জীবনে কমই এসেছে।

মুশকিল-আশানকে আমি ভুলিনি, আর সে-ও আমায় ভোলেনি। মুশকিল-মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ ক'রে আমার কানে এসে পৌঁচেছে তার অভয় বাণী—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান।

জীবন-পথে কত মুশকিলেরই না দেখা পেলুম—মুশকিলের মরুভূমি মরীচিকা ও চোরাবালি, মুশকিলের হাড়িকাঠ, কড়িকাঠ, খাঁড়া, ছোরা ছুরি—কত মনোহররূপে, কত বীভৎসরূপে এসেছে তারা! সব কাটতে কাটতে আজ মুশকিলের সিংহদ্বারের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। ভরসা আছে, যথাসময়ে কানে এসে পৌঁছবে মুশকিল-আশানের সেই অভয় বাণী—কোন ভয় নাই—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান!

পথে

এক দিন স্কুলের ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি নামল মুষলধারায়—

ইস্কুল থেকে :বেরুতেই পারলুম না। পেটে দুর্দম ক্ষুধা এবং আকাশের কর্ণভিদ্ গর্জন ফাঁকা ক্লাসে বসে পরিপাক করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ঘণ্টাদেড়েক দারুণ বর্ষণের পর প্রকৃতি শান্ত হলেন। বেরিয়ে পড়লুম দুই ভাইয়ে—ইস্কুল থেকে বাড়ী অনেক দূরে, পড়ি ডফ্ সাহেবের ইস্কুলে।

সেকালে কলকাতায় ঘণ্টাখানেক ঝেড়ে বৃষ্টি হ'লে—যিনি যেখানে তাঁকে সেইখানেই থাকতে হোতো দু-তিন ঘণ্টার জন্য। প্রায় সব রাস্তাতেই জল দাঁড়াত। ইস্কুলের ছোট ছেলেদের ডুব-জল, বুক-জল, —হাঁটু-জল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না। খাটা-পায়খানার যত ময়লা ভাসত সেই জলে আর তারই ওপরে দাপাদাপি ও লাফালাফি করতে করতে ছাত্রদল বাড়ী ফিরত। এমন দিনে বাড়ীতে ফিরে আমাদের সাবান দিয়ে স্নান করতে হোতো।

যে সব রাস্তায় জল দাঁড়াত না অথবা বেশী দাঁড়াত না, সে সব রাস্তায় হোতো কাদা—সে এক রকম চট্‌চটে ঘন এবং সাংঘাতিক রকমের পেছল কাদা, শতকরা পঁচিশ জন পথিককে আছাড় খেতেই হোতো। এই পা পিছলে পড়ে গিয়ে কর্দমাক্ত হওয়াটাকে ছেলেদের ভাষায় বলা হোতো—আলুর দম হওয়া। কতদিন যে আলুর দম হ'য়ে বাড়ী ফিরেছি তার আর ঠিকানা নেই।

বর্ষাকালে জলও দাঁড়ায় না, কাঁদাও হয় না এমন রাস্তা সে সময়ের শহর-রক্ষকেরা দেশী পাড়ায় রাখা বোধহয় পছন্দ করতেন না। এ যুগেও এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

যাই হোক, বই, ছাতা, জুতো, কাঁচা-কোঁচা সামলাতে-সামলাতে অর্থাৎ দু-হাতে দশ হাতের কেরামতি করতে-করতে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলুম ফুটপাথের ওপরে খানিকটা ডাঙা জায়গায় বেশ একটা ভিড় গোল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র-বস্তুটিও যে নেহাৎ মামুলী নয় তা ভিড়ের হালচাল দেখে বাইরে থেকেই বুঝতে পারা যায়।

সেদিন ক্ষুধার টান ছিল প্রবল, তাই মজা দেখবার প্রলোভন উপেক্ষা ক'রেই এগিয়ে চললুম ; এমন সময় ভিড় থেকে হো-হো হাসির হর্‌রা শুনতে পাওয়া গেল—ছুটলুম সেদিকে। জুতো, ছাতা, বই সমেত কোনো রকমে এঁকে-বেঁকে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখতে পেলুম—পাগলিনী !

রাস্তার পাগলী বলতে লোকের মনে যে ছবি জাগে এ সে রকম নয়। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায়, রাস্তার সঙ্গে তার পরিচয় সবে-মাত্র সুরু হয়েছে। পাগলিনীর মাথা রুক্ষ নয়, দিব্যি পরিপাটি ক'রে আচড়ানো, তেল-চকচকে এলানো চুল—সীঁথেয় ঝক্ ঝক্ করছে সিঁদুর, কানে ও হাতে সোনার গয়না। অঙ্গে চওড়া কালা-পেড়ে পাতলা শাড়ী, একেবারে ধোপদোস্ত, বেশ বাগিয়ে পরা। স্থূলকায়া হ'লেও দেখতে খারাপ নয়। চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুচ্ছে, বয়স তার পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী হবে না।

দেখলুম, পাগলিনী নিঃশব্দে কাঁদছে আর ভিড়ের লোকেরা উচ্চরবে হাসছে।

ভিড় থেকে এক জন লোক জিজ্ঞাসা করলে—শ্যামবাবুকে এত ভালবাসিস্ তো তাকে ছাড়লি কেন?

পাগলিনী কাঁদতে-কাঁদতে বললে—তাড়িয়ে দিলে যে!

ইতিমধ্যে আর একজন বললে—তোর শ্যামবাবু আগেকার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—কোথায় গিয়েছে। কত নম্বরের বাড়ী?

লোকটা যা-তা একটা ঠিকানা বলে দিলে। পাগলী বার দু-তিন তা আওড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কত দূর, কোন রাস্তা দিয়ে গেলে পৌছতে পারব সেই ঠিকানায়?

একজন রসিকতা ক'রে বললেন—তোকে সেখানে যেতে হবে কেন? শ্যামবাবু বলেছে, সে নিজে এসে তোকে নিয়ে যাবে এখান থেকে।

পাগলিনীর মুখে হাসি ফুটল। খুশীতে ভরপুর হ'য়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যি বলেছে! তোকে বলেছে! তাকে নিয়ে এলি না কেন?

লোকটা বললে—চতুর্দোলা ভাড়া করবে, ব্যাণ্ড ভাড়া করবে তবে তো আসবে। তোকে তো আর এম্‌নি নিয়ে যেতে পারে না?

চারদিকের সবাই হেসে উঠল—পাগলিনী আবার কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে।

ভিড়ের লোকেরা পাগলিনী সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলতে লাগল। কেউ বললে,—ও ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, শ্যামবাবু বলে একটা লোক ওকে বের ক'রে নিয়ে এসে কিছু দিন বাদে ফেলে পালিয়েছে, তাইতে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

আর একজন বললে—ভদ্রঘরের মেয়ে নয়—তবে শ্যামবাবুর জন্যই ও পাগল হয়েছে।

পাগলিনীকে দেখে মনের মধ্যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল কিন্তু তার জীবনকাহিনী করুণতর বলে মনে হোলো।

সেই রাত্রে খাবার সময় সবার সামনে পাগলিনীর গল্প করলুম। দেখলুম আসরের সবাই গম্ভীর হ'য়ে পড়লেন—দু-একজন সহানুভূতি-সূচক একটু শব্দ উচ্চারণ করলেন মাত্র।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে সকলেই মুখ খুল্‌ল। একজন শেষ রায় দিয়ে দিলেন—ও মেয়েগুলোর শেষকালে এ-ই হ'য়ে থাকে।

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার তো এতক্ষণ মনে হচ্ছিল শ্যামবাবু লোকটাই খারাপ। নেই বা হোলো সে ভদ্র গৃহস্থঘরের কন্যা। কিন্তু ভালো সে বেসেছিল একজনকে, যার জন্য আজ পাগলিনী হ'য়ে রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছে—এত বড় সত্যটাকে এরা দু-টো চুক্‌চুক্‌ আওয়াজ ক'রে রায় দিয়ে দিলে, যত দোষ ঐ মেয়েটার!

কিন্তু মানুষের চিত্তলোক, যেখানে নিয়ত সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাজ চলেছে, সেই আমার চিত্তলোকে পাগলিনীর জন্য নতুন মহল তৈরি হ'তে সুরু হোলো।

পাগলিনীকে ইস্কুল-যাতায়াতের পথে রোজই দেখি। প্রায় রোজই তাকে একই জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত। দেখতুম, রাজ্যের ছোট ছেলে এবং সকল বয়সী স্ত্রী-পুরুষ তাকে সর্বদাই ঘিরে রয়েছে, তার আকুলতা দেখে হাসাহাসি করছে। ছেলেরা বলছে—ঐ দেখ, ঐ দূরে তোর শ্যামবাবু পালিয়ে যাচ্ছে।

পাগলী উঠে থপ্‌-থপ্‌ ক'রে দৌড়ল সেই কাল্পনিক শ্যামবাবুর উদ্দেশ্যে—কিছু দূর গিয়ে শ্যামবাবুকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে এল। তার ব্যর্থতা দেখে সবাই হেসে উঠল।

এক দিন ইস্কুলে যাবার সময় দেখি পাগলিনীকে ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়েছে। দু-এক জন ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি করছেন। একজন বললেন—এ সব লোককে পুলিশে দেওয়া উচিত।

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখি, পাগলিনী ফুটপাথের ধারে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে! তার কপালের খানিকটা বেশ কেটে গিয়েছে, দু-তিন জন লোক মিলে দমকল থেকে আঁজলা ক'রে জল এনে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছে।

শুনলুম, সেদিন সকাল থেকেই পাগলিনী শ্যামবাবু, শ্যামবাবু ক'রে চেঁচিয়ে পাড়া একেবারে মাথায় ক'রে তুলেছিল। একটা লোক তাকে বলে যে, শ্যামবাবু বলে এখানে চেঁচালে কি হবে, সে তো ঐ ও পাড়ায় থাকে।

আর যায় কোথায়! সংবাদটি শুনেই পাগলী উঠে দৌড় মেরেছিল সেই ও-পাড়ার দিকে। স্থূল শরীর, কয়েক পা যেতে না যেতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে গেছে। নিঃস্বার্থভাবে সকলে যখন সেই নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগে আত্মহারা, তখন জনকয়েক সহৃদয় লোক এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই পাগলিনীর নামকরণ হ'য়ে গেল। শ্যামবাবু-পাগলী বললেই ও-পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই বুঝতে পারত কার নাম করা হচ্ছে।

বছর-দেড়েক পরে আমরা ও-পাড়ার ইস্কুল ছেড়ে দিলুম। শ্যামবাবু পাগলীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, এমন সময় এক দিন দেখি, পাগলিনী হেদোর ধারে বেশ একটি জনতার মধ্যে বসে তার সেই সনাতন শ্যামবাবু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পাগলিনী সেই থেকে হেদোর ধারেই রয়ে গেল।

হেদোর গায়ে ফুটপাথের ধারেই সে বসে থাকে। কখনো বা ভিক্ষে করে। কিন্তু 'একটি পয়সা দে বাবা'র চাইতে 'ওরে, শ্যাম বাবু কোথায় বলতে পারিস কথাটাই বলে বেশী। ক্রমে তার দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে গিয়ে পথেরই মতন সে মলিন হ'য়ে উঠতে লাগল। বস্ত্র ছিঁড়ে

গেলে দু-এক দিনের মধ্যে দেখতুম কোথা থেকে নতুন একখানা কোরা ধুতি কিংবা শাড়ী সে জোগাড় করেছে। কোথায় খেত জানি না, মধ্যে মধ্যে তেলে-ভাজা খেতে দেখতুম—সে সময়ে হেদোর ধারের মুখরোচক তেলেভাজা অনেকেরই নরকযাত্রার পথ সুগম করেছিল।

কখনো ফুটপাথের ধারে, কখনো বাগানের মধ্যে, বৃষ্টি-বাদলের সময় কাছাকাছি কোনো গাড়ী-বারান্দার তলায়—এইভাবে তার জীবন অগ্রসর হ'তে লাগল।

আমরাও বড় হ'তে লাগলুম—লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেটে একটা-আধটা টান মারার বয়সে পৌঁছে গেলুম। কিন্তু পাগলিনীর সেই এক ভাব—শীতাতপবর্ষণ মাথায় নিয়ে সে পথচারীদের জিজ্ঞাসা ক'রে চলেছে শ্যামবাবু ঠিকানা, কোন রাস্তা দিয়ে গেলে তার বাড়ীতে পৌঁছতে পারা যাবে।

ক্রমে—পথচারী বা পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সেই একঘেয়ে আমোদে অরুচি ধরে গেল, তাই তারা তাকে ত্যক্ত করা ছেড়ে দিলে। পথে যারা নিত্য যাওয়া-আসা করে তাদেরও কৌতূহল মিটে গিয়েছে। সবাই নিজের মনের মতন তার একটা ইতিহাস তৈরী ক'রে নিয়েছে, সকলেই তাকে মেনে নিয়েছে। শ্যামবাবু-পাগলীর মধ্যে নূতনত্ব আর কিছুই নেই—তার সম্বন্ধে জগৎ ক্রমেই নিরপেক্ষ হ'য়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যে যদি কোন কৌতূহলী পথিক তার কথার জবাব দিত তো পাগলী তার সঙ্গে ইনিয়ে-বিনিয়ে শ্যামবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকৃত। অশ্রুজল আর তার চোখে দেখিনি তবে কণ্ঠে তখনো অশ্রু জমাট ছিল।

দিন যেতে লাগল, আমরা লায়েক হ'য়ে উঠতে লাগলুম। স্বদেশীর পূত স্পর্শে 'বিড়ি' দ্রব্যটি জাতে উঠে গেল এবং আধুনিক যুগের খদ্দরের মতন সকলেই সেই দেশজাত শিল্পটির প্রতি মনোযোগী হ'য়ে উঠতে লাগল। লুকিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশে বসে বিড়ি ফোঁকবার জন্ত প্রায়

রোজই বিকেলে আমরা হেদোয় যেতুম,—পাগলিনীর সে রূপ আর নেই, যা দেখে একদিন চম্‌কে উঠেছিলুম। সে ছিল যাকে বলে বেশ স্থুলকায়া। ক্রমে তার অঙ্গের মেদ ও পেশীগুলো শুকিয়ে গিয়ে চামড়া ঝুলে পড়তে লাগল, সুন্দর চোখ দুটো নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। চুলগুলো কিছু উঠে গিয়ে ও জট পড়ে বিশ্রি হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু একদিন দেখলুম কে তার মাথা কামিয়ে দিয়েছে। দু-পাশ থেকে গাল-দুটো ঝুলে চিবুক ছেড়ে নেমে পড়ল—হঠাৎ কোনো অজানা লোকের সামনে পড়লে সে ব্যক্তি ঠিক্‌রে পালিয়ে যেত।

পাগলিনী এখন আর পথের লোককে শ্যামবাবুর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে না। যে কোনো সুবেশ পুরুষ, তা সে ছেলেই হোক কি বুড়োই হোক—আলিঙ্গনে উন্মত্তা হ'য়ে তার দিকে ধাওয়া করে। বেচারী পথচারী ধোপদোস্ত জামা-কাপড় প'রে চলেছে আনমনে, হঠাৎ সম্মুখে আলিঙ্গনোন্মত্তা সেই তাড়কা রাক্ষসীকে দেখে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, মুহূর্ত পরেই প্রাণভয়ে সেই পলায়ন দৃশ্য, পথিক-মাত্রেই উপভোগ করত।

কিছু দিন আমোদ উপভোগ ক'রে লোকে এলে গেল। এ ব্যাপারটাও তাদের সয়ে গেল, আর কিছু মজা পায় না তারা। কিন্তু পাগলিনীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে সমানে একে-ওকে ধরে বেড়াতে লাগল—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তে কোনো বিকার নেই, সেই এক ভাব।

তারপর আমাকেও একদিন পথ ডেকে নিল যাত্রার তপস্যায়। সাত বৎসর ধরে মাতৃভূমির রাজপথে ঘুরে-ঘুরে কত ঘটনাই দেখলুম, কত কাহিনীই শুনলুম। কত পাগলের পাশে শুয়ে-বসে রাস্তায় রাত কাটিয়ে পথের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠল, আবার তেমনি অকস্মাৎ পথের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছুটে গেল—আবার ঘরের ছেলে ফিরে এলুম ঘরে।

কলকাতায় ফিরে আত্মস্থ হ'য়ে দেখতে পেলুম এখানেও পরিবর্তনের ঝড় ছুটেছে হু-হু ক'রে। পরিবর্তন ঘটছে তার সামাজিকতায়, তার

আধ্যাত্মিকতায়, পরিবর্ত্তন ঘটছে তার মিত্রতায় তার ব্যস্ততায়। অন্যের পরিবর্ত্তন তার এমন ঘটেছে যে চমকে উঠতে হয়। কত খোলার বাড়ী হয়েছে বাগানবাড়ী, কত বস্তিতে বসেছে বাজার, কত বাজার হয়েছে ওজোড়, কত এঁদো-পাঁদাড় হয়েছে গুলজার। এরই মধ্যে, একদিন দেখলুম, এই তরঙ্গসঙ্কুল পরিবর্ত্তন-পারাবারের মধ্যে পাগলিনী ঠিক হেদোর ধারে বসে আছে, সাত বছর আগে যেমনটি তাকে বসে থাকতে দেখেছিলুম।

পাগলিনীর চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সেদিন তাকে যে রকম দেখে গিয়েছিলুম তার চেয়ে অনেক কৃশ হ'য়ে পড়েছে কিন্তু কৃশ হ'লেও সেদিনকার সেই বীভৎসতার ছাপ তার চেহারায় আর নেই। কয়েক দিন বাদেই বুঝতে পারলুম, তার সেই শ্যামবাবু-শীকার করার ভাবটাও একেবারে কেটে গিয়েছে। কথাবার্ত্তা একেবারেই বলে না বললেই হয়, কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতে গেলে চুপ ক'রে থাকে, নয় ত বিশ্রি গালাগাল দেয়। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলেছে, সেদিকে তার দৃক্‌পাতও নেই, হঠাৎ মুখ তুলে যার দিকে চোখ পড়ল তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—একটা পয়সা দাও না।

সকলকে সমান ভাবে সম্বোধনও করে না, কারুকে তুমি, কারুকে বা তুই। শহরশুদ্ধ লোকের টনক নড়ে গেল—হেদোর ধারের শ্যামবাবু-পাগলী আর শ্যামবাবুর খোঁজ করে না।

আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল। একদিন, তখন আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজা হ'য়ে গিয়েছে, সামনেই কালীপূজা। সন্ধ্যে থেকে ঘণ্টা দু-তিন মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় উঠে আশ্বিনের বুকে অঘ্রাণের আমেজ লাগিয়ে দিলে—বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়ার তেজ যেন বেড়ে গেল।

রাত্রি একটা বেজে গিয়েছে। নিঃশব্দ জনহীন পথ বেয়ে জল-

কাদা বাঁচিয়ে বাড়ী ফিরছিলুম—দেখলুম, হেদোর সামনের ফুটপাথে পাগলিনী বসে আছে। আঁচলের খানিকটা ফুটপাথের ওপরে পাতা, তার ওপরে চাট্টি মুড়ি। আমাকে দেখেই বললে—একটি পয়সা দে না রে!

আশ্চর্য! তার কণ্ঠস্বর তেমনিই রয়েছে—সেই অশ্রু-সজল তীক্ষ্ণ অথচ করুণ কণ্ঠস্বর।

একটা পয়সা বের ক'রে তার কাছে যেতেই সে হাত তুলে পয়সাটা নিয়ে আবার খেতে আরম্ভ করলে। তাকে দেখতে-দেখতে কি জানি আমার কেমন একটা কৌতূহল হোলো, আমি তাকে একটা প্রশ্ন ক'রে ফেললুম।

বিশ বছর ধরে দেখলেও তার সঙ্গে মুখোমুখি কখনো কথা বলিনি। প্রশ্ন করলুম—হ্যাঁ রে, তোর শ্যামবাবু এখন কোথায় থাকে?

পাগলী একবার আমার মুখের দিকে চাইলে, তার পরে তার অর্দ্ধাবৃত বুকের আবরণ সরিয়ে বুকের মাঝখানটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

একেবারে চমকে উঠলুম! তবে! তবে কি এত দিন ধরে তাকে যা দেখে এলুম তা কি তার আসল রূপ নয়! এই দীর্ঘ দিন ধরে তার সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে কত ভাঙা-গড়া চলেছে সে কি সব বৃথাই গিয়েছে! হোতেও পারে। বিচিত্র নয় যে, পাগলিনীর শ্যামবাবু—রাম-শ্যাম-যতুর শ্যাম নয়। তার শ্যাম অন্তরে থেকেও সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে—তারই আহ্বানে সে কূল ছেড়ে অকূলে ভেসেছে। একে-তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় গেলে পাব তাকে? যার-তার কথায় ছুটেছে দিগ্বিদিকে—কোনো বাধা মানেনি, সাংঘাতিক ব্যথা পেয়েছে অঙ্গে, রক্তাক্ত দেহ বিছিয়ে দিয়েছে পথের ওপর—যে পথে একদিন শ্যামের পদপাত হবেই। নয় ত বা পথের এক পাশে বসে কাতর কণ্ঠে কেঁদেছে—কোথায় গেলে শ্যামের দেখা পাব।

তার পরে একদিন শ্যাম এসে তাকে দেখা দিলেন সুন্দর বেশে, পথচারীর রূপ ধরে। শ্যাম এলেন কখনো যুবক, কখনো কিশোর, কখনো বা বালকের রূপ ধরে। পাগলিনী আহ্লাদে আটখানা—ছুটেছে আলিঙ্গন করতে কিন্তু শ্যাম তবু ধরা দেয় না। বিগতযৌবনা লোলচর্ম্মা কুৎসিতা পাগলিনী শবরীর মত প্রতীক্ষায় ছিল, এমন সময় শ্যাম সাড়া দিলেন অন্তরে—চাপল্য তার স্তব্ধ হয়ে গেল। বাইরের জগৎ রইল পড়ে বাইরে, তার প্রেমালাপ চলতে লাগল শ্যামের সঙ্গে অন্তরে।

কিছুই বিচিত্র নয়!

মাতাল

মাতালের ঠিক সংজ্ঞা এখনও নির্ণীত হয়নি। যে মদ্যপান করে তাকেই কি মাতাল বলা চলে? তা বোধ হয় নয়, কারণ 'মাতাল' শব্দটি অপরাধাত্মক তো বটেই এবং প্রয়োগও হ'য়ে থাকে প্রায় আক্রমণ হিসাবেই। বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের নাটক-নভেলে পর্য্যন্ত মাতালের কেলেঙ্কারী পড়ে, নিজের বা জানাশোনা কোনো মদ্যপায়ী পূর্ব্বাচার্য্যদের ইতিবৃত্ত শুনে এবং নিজে দেখে বিচার ক'রে লোকে মদ্যপায়ীকে 'মাতাল' বলে গালাগালি দিয়ে থাকে।

অথচ এই মদ অনেকেই খায়। দেশ-বিদেশে ঘুরে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে যাঁদের আসতে হয়েছে সারা জীবন ধরে, তাঁরাই জানেন যে পরিচিতদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঁচিশ জন লোক মদ্যপান করে থাকে। যাঁরা মদ্যপান করেন না তাঁদের মধ্যে শতকরা একটা মোটা অংশ মদ্যপান করেন না—খেতে খারাপ লাগে, বাড়ীর ভয়, স্ত্রীর ভয় ইত্যাদি নানা ভয়ে—মদের প্রতি ভয় বা ঘৃণাবশতঃ নয়।

'মাতাল অসহনীয়'—এই বাক্যের মধ্যে কিছু সত্য আছে নিশ্চয় কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সহনীয় মাতালও আছে। সংখ্যায় কম হ'লেও এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায় যে মদ্যপান করলেও অভদ্র নয় এবং মত্ত অবস্থাতেও যে ভদ্রতা-চ্যুত হয় না। এ কথা ভুললে চলবে না যে, শুধু মদ্য-পানের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই 'ভালো'র সংখ্যা অল্পই হ'য়ে থাকে।

'অধিকারী ভেদ' বাক্যটি যে নিশ্চিত সত্য তা আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। যারা মদ্যপানের অধিকার নিয়েই সংসারে আসে

তাদের ছাড়া মন্তপানের অধিকার আর কারুর নেই। কিন্তু মুস্কিল এই, কে যে সত্যিকারের অধিকারী আগে থেকে তা জানবার উপায় নেই। সকলেই নিজেকে 'অধিকারী' মনে ক'রে শুরু ক'রে দেয় এবং অনধিকারিত্ব প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও ছাড়তে পারে না, তাইতেই মন্তপায়ীর এত দুর্ণাম। যে যুক্তিতে ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দেবতা করা হয়েছে, সেই যুক্তি অনুসারেই মন্তপায়ীকে 'মাতাল' বলা হয়েছে। ছেলেবেলায় অনেক মাতালই চোখে পড়েছে, তারই কয়েকটা নমুনা এখানে দিচ্ছি।

বাল্যকালে, বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে, 'মাতাল' দেখবার আগেই ভাগ্যগুণে এক মন্তপায়ীর সংস্পর্শে এসেছিলুম। যাঁর কথা বলছি, তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ ছিল প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসরের। কিন্তু বয়সের এই বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল ভদ্রলোকের অপার ঔদার্য্য। আমি, আমার ছোট ভাই ও তিনি—এই তিন জনে মিলে আমরা এমন আড্ডা জমিয়েছিলুম যে লোকের চোখে তা বিসদৃশ ঠেকৃত। এ কথা একদিন শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন—ওরা নিজেরা বুড়ো হয়েছে কি না তাই সবাইকে বুড়ো দেখে। ওদের কথা কানে তুলো না ব্রাদার।

তাঁর অন্তরটি ছিল কাব্যময়। কাছে গিয়ে বসলেই, দু-চারটে এ-কথা-সে-কথার পর প্রায়ই কাব্যের কথা পাড়তেন—অবিশ্যি ইংরিজী কাব্য। কাব্যের অলঙ্কার নয়, কাব্যের ভাবরূপের কথা। বয়সের হিসাবে আমাদের বুদ্ধি একমাত্র 'লেখাপড়া' ছাড়া আর প্রায় সব বিষয়েই একটু 'ইয়ে' থাকলেও কাব্যসাগরে ডুব মারবার মতন দম তখনো তৈরি হয়নি। কিন্তু কাব্যের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব-স্বপ্নকে যে অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে তিনি আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছে দিতেন তা স্মরণ ক'রে আজও বিস্মিত হই। বালক-মনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এমন সহমর্ম্মিতা তাঁর ছিল যা কদাচিৎ মেলে।

এই ভদ্রলোক মদ্যপান করতেন। এমনিতেই তাঁর স্বভাবটি ছিল মিষ্টি, কিন্তু যখন মদ্যপান করতেন তখন তাঁর কথাবার্ত্তা, ব্যবহার মধুরতর হ'য়ে উঠত। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের 'লেখা-পড়া' নাটকের অভিনয় স্বরু হোতো আর এই সন্ধ্যে-বেলাটাই ছিল তাঁর মৌতাতের সময়। শনি, রবিবার ও অন্য ছুটির সময় বাড়ীর অগোচরে ফুক্‌ফাক্ পালিয়ে মাঝে-মাঝে আমরা দু-ভাই তাঁর আসরে গিয়ে হাজির হতুম। এই দিনগুলির কথা স্মৃতি-সাগরের তলায় মহামূল্য রত্নের মতন থিতিয়ে পড়ে থাকলেও তাদের ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য্য আমার সারা-জীবনকে ব্যেপে রয়েছে।

প্রধানতঃ এই কারণেই, হয়ত এর সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের কিছু সংস্কার থাকলেও থাকতে পারে—মদ্যপায়ীর প্রতি একটা কৌতূহল ছিল ছেলেবেলায়। বয়সের সঙ্গে চোখ-কান খুলতে লাগল আর মদ্যপায়ীর বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ প্রকট হোতে লাগল চোখের ওপর।

সে যুগে অর্থাৎ আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতার রাস্তায় বেরুলে প্রায়ই মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। তখনকার দিনের তুলনায় এখন মাতালের সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে গেলেও পথে-ঘাটে মাতালের কেলেঙ্কারী আর দেখতেই পাওয়া যায় না, বলা চলে। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, ডেকো-হেঁকো মাতালের চাইতে চোরা-মাতালের সংখ্যা বেড়েছে বেশী।

আমাদের পাড়ায় ছিল হারাণের দোকান। তার বাড়ী ছিল আহিরীটোলা অঞ্চলে, আর দোকান ছিল এদিকে। আমাদের জ্ঞান হওয়া এস্তক হারাণকে সেই দোকানে দেখেছি। হারাণ ঘুড়ি তৈরী করত। তার মতন ভাল ঘুড়ি তৈরি করতে কলকাতায় আর কেউ পারত না কলকাতা মানে, এখানকার মধ্য ও উত্তর-কলকাতা। বালীগঞ্জ বা ভবানী-পুরকে কলকাতার মধ্যে ধরা হোতো না। ভবানীপুরের বাসিন্দারা এদিকে

আসতে হোলে বলতেন, কলকাতায় যাচ্ছি। ঘুড়ি ছাড়া হারাণ লম্বা তারের পেছনে কাঠের গোল চাকৃত্তি লাগানো 'ফাইল'ও তৈরী করত। সকাল সাতটা-আটটা থেকে বেলা বারোটা, আবার ওদিকে বেলা দুটো-তিনটে থেকে রাত্রি দশটা অবধি, তার দোকানে গেলেই দেখতে পাওয়া যেত সে কিছু-না-কিছু করছেই—সে ছিল একলা অর্থাৎ কাজের জন্ম অন্য কোনো লোক সে রাখত না।

হারাণ ছিল একেবারে আর্টিস্ট। বড় বড় মোটা বাঁশ এনে পিপীলিকার মতন অধ্যবসায়ে সেই বাঁশ চিরে-চিরে ছোট-ছোট কাঠি ক'রে, সেগুলোকে চেঁচে-ছুলে ঘুড়ির কাঁপ তৈরী করত। ছুটির দিন পাড়ার ছেলেরা ঝাঁক বেঁধে হারাণের সামনে গোল হ'য়ে বসে তার কাজ দেখত।

পঞ্চাশের ওপর বয়েস হ'লেও বুড়ো লোককে সে একেবারেই কাছে ঘেঁষতে দিত না। পাড়া-বেপাড়া যত ছেলের সঙ্গে ছিল তার ভাব। আর তারাই ছিল তার বন্ধু।

ছেলেদের কারুর আসল নাম ধরে সে ডাকত না! প্রত্যেকেরই একটা ক'রে সে নাম দিয়েছিল আর সেই নামেই তাকে ডাকত। নামকরণ করার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল—প্রত্যেকের নামই ছিল কোন আনাজের বা সব্জীর, যেমন—আলু, পটল, ঝিঙে, করলা ইত্যাদি। মানবকের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে শাক-শব্জীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আবিষ্কার করবার প্রতিভা ছিল তার আশ্চর্য্য রকমের।

একবার পাড়ায় একজনেরা এল। তাদের বাড়ীর একটি ছেলে ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে খুবই কাহিল হ'য়ে গিয়েছিল। ছেলেটির সঙ্গে দু-দিনেই আমাদের খুব ভাব জমে গেল। নতুন বন্ধুটিরও ছিল ঘুড়ি ওড়াবার সখ। একদিন বিকেলে তাকে নিয়ে হারাণের দোকানে গিয়েছি ঘুড়ি কিনতে—ছেলেটির গায়ে ছিল সবুজ জমির ওপর লম্বালম্বি

শাদা ডোরাকাটা শার্ট। হারাণ তখন ঘাড় নীচু ক'রে ঘুড়ির কাঁপ চাঁচছিল। আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে চেয়েই বললে—হ্যাঁ ভাই রাঙা-আলু, এই চিচিঙ্গেতে কোথা থেকে জোগাড় করলে ভাই?

বলা বাহুল্য, হারাণ আমাকে রাঙা-আলু বলে ডাকত। আমাদের সেই নতুন বন্ধুর নাম ছিল মনোমোহন, ডাক নাম মোনা। জমিদারের একমাত্র ছেলে, বাড়ীতে ও দেশে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তার। শিশু অবস্থা থেকে আজ্ঞে, হুজুর, বাবু শোনাই তার অভ্যেস। নেহাৎ ম্যালেরিয়ার ঠেলায় কলকাতায় চলে এসেছে—তাকে কি না চিচিঙ্গে! মনোমোহন তো রেগে একেবারে টং হ'য়ে গেল। সেও ঘুড়ি কিনতে এসেছিল কিন্তু ঘুড়ি না কিনেই চলে এল। আমাকে বললে—ঐ ছোটলোকটার সঙ্গে এত ভাব কেন রে তোর? তোকে রাঙা-আলু বলে আর তুই কিছু বলতে পারিস নে?

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে চিচিঙ্গের সঙ্গে হারাণের এমন ভাব জমে গেল যে তার বাড়ীর লোকেরা পর্য্যন্ত বলতে লাগল—দিন রাত্রি একটা বুড়োর সঙ্গে তোর এত কথা কিসের রে?

হারাণের হাল-চালই ছিল এক রকমের। চমৎকার রং-বেরংয়ের ঘুড়ি সে তৈরি করত কিন্তু আমাদের মনের মতন রং বেছে ঘুড়ি কেনবার উপায় ছিল না। প্রতিদিন তার দোকানের দরজায় একখানা শ্লেট ঝুলত আর তাতে লেখা থাকত—আজ এক-ময়লা, আজ সতরঞ্চি, আজ পক্ষীওয়ালা ইত্যাদি। এক দিনে নানা রংয়ের ঘুড়ি বিক্রি না করার পক্ষে তার যুক্তি ছিল এই যে, রং-বেরংয়ের ঘুড়ি উড়লে আকাশ মানায় না। আমাদের যুক্তি ছিল ঠিক তার উল্টো, কিন্তু আমাদের কোন কথাই সে মানত না। সে বলত—তবে অন্য জায়গা থেকে কিনে আনো—আজ শেলেটে যখন লেখা হ'য়ে গেছে এক-ময়লা তখন অন্য ঘুড়ি আর এখানে বিক্রি হবে না।

আমরা বলতুম—ওঃ, একেবারে হাইকোর্টের বিচার!

হারাণ হেসে-হেসে বলত—আমার বিচার হাইকোর্টের বিচারের বাড়া! বুঝলে ভাই রাঙা-আলু, হাইকোর্টের রায় আপীলে টলে যেতে পারে কিন্তু হারাণের বিচার কোনো আপীলেই টলে না।

এমনি অদ্ভুত ছিল তার হাল-চাল।

একদিন বিকেলে হারাণের দোকানে ঘুড়ি কিনতে গিয়ে দেখি, পাড়ার ছয়-সাতটি ঘুড়ি-উড়িয়ে ছেলে হারাণের সামনে উবু হয়ে বসে রয়েছে। বিমর্ষ তাদের মুখ—সামনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে গালে হাত দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে বসে আছে হারাণ। সেই পরিস্থিতির গাম্ভীর্য্য রক্ষা ক'রে ইশারাতে এক জনকে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি?

বন্ধু কোনো কথা না বলে ইশারাতেই হারাণকে দেখিয়ে দিলে।

কিছুই হদিশ না পেয়ে হারাণকে বললুম—একখানা দেড়তে ঘুড়ি দাও তো?

হারাণ এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রেই ছিল। আমার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে অতি কাতরভাবে বলল—আজকে আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই রাঙা-আলু।

তার মুখের চেহারা দেখে ও কথা শুনে মনে হোলো, বাড়ীতে কেউ মারা-টারা গেছে।

সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে হারাণ?

হারাণ স্বভাবতই বক্-বক্ করতে ভালবাসত। দু-হাতের সঙ্গে তার মুখও সমানে চলতে থাকৃত। এক-এক দিন ঘুড়ি কিনতে গিয়ে তার বক্‌বকানি শুনতে-শুনতে এত দেরী হ'য়ে যেত যে পালিয়ে আসতে হোতো। অনেকক্ষণ বাক্-সংযম ক'রে এবার তার ধৈর্য্যচ্যুতি হোলো। হারাণ শুরু করলে—আরে ভাই রাঙা-আলু, কি বলব! আজ ক'দিন থেকে ওপরের কষের একটা দাঁত চক্-চক্ ক'রে নড়ছে।

কাল রাত থেকে জিভটা লেগে গেছে সেই দাঁতটার পেছনে, দাঁতটাকে ওখান থেকে সে তাড়াবেই তাড়াবে—খেতে, শুতে, কাজ করতে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। জিভটাতে বেশ ক'রে মনের লাগাম চড়িয়ে টেনে নিয়ে এসে কাজ করতে শুরু করি আর সেই সুযোগে জিভটা আবার দাঁতের পেছনে লেগে যায়। আরে ভাই, কাজ করব হাতে, মন থাকবে হাতধরা, তবেই তো হাতের কাজ হবে! তা সেই মনই যদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে জিভের সঙ্গে যোগ দেয় তো হাতের কাজ কি ক'রে হয়!

কাজ করতে না পারার এমন কিণ্টারগার্টেনীয় ব্যাখ্যা শুনে হাসি পেলেও চেপে যেতে হোলো। বললুম—ও দাঁতটা তুলিয়ে ফেল।

হারাণ একটু বক্র-হেসে বল্‌লে—রাঙা-আলু ভাই, তুমি কি আমায় ছেলেমানুষ পেয়েছ? এই ঝিঙে-ভাইও বলছিল দাঁতটা তুলে ফেলতে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, শুধু ওটা নয়, বত্রিশ-পাটি দাঁতই তুলে ফেল্‌ব।

হারাণ ছিল ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। হঠাৎ তার ঐ সর্ব্বনাশা স্পৃহা দেখে আমরা ভড়কেই গেলুম। ঝিঙে জিজ্ঞাসা করলে—কেন? সবগুলো তুলবে কিসের জন্য?

হারাণ বললে—ঝিঙে-ভাই, ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একটা দাঁতে যদি এক হপ্তার কাজ বন্ধ করে, তা হলে বত্রিশটাতে ক'হপ্তা হয় বল দিকিন? এত দিন যদি কাজ না করতে পারি তা হ'লে আমার যন্ত্রণা ভোগ ও ক্ষতির কথা ছেড়েই দাও, কত লোকের কত রকমের অসুবিধা হবে বল দিকিন? কাজ কি ভাই অত হাঙ্গামার! শাস্ত্রে বলেছে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, ব্যস্।

এই রকম সব পাকা-পোক্ত হিসাব ও যুক্তির বাঁধনে হারাণ রাজ্যের ছেলের মন বেঁধেছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর একজন বললে—আমাদের হারাণের বুদ্ধি আছে, যে যাই বলুক।

কথাটা শুনে হারাণ বেশ খুশী হ'য়ে বললে—ট্যাড়স্ ভাই, তোমাদের এই ঘুড়িওয়ালা হারাণ অনেক হারাণবাবুর চেয়ে বুদ্ধি ধরে বেশী। যদি বল, তবে তুমি এ কাজ করছ কেন, হাইকোর্টের জজ হ'লেই তো পারতে। তার উত্তরে আমি বলব, বুদ্ধি কম থাকার দরুণ যে হাইকোর্টের জজ হতে পারিনি তা নয়—এ কাজ করাচ্ছে আমার নেয়ৎ।

এই বলে হারাণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে।

তাকের ওপরে তাড়া করা ঘুড়ি রয়েছে দেখে বললুম—ঐ তো অত ঘুড়ি রয়েছে, দাও না।

হারাণ বললে— তা কি হয়! আজ আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই, সব বাড়ী যাও।

বিকেল বেলাটা হোলো মাটি। ঘুড়ির বদলে—হারাণ কাল দাঁত তোলাবে সেই সংবাদটি সংগ্রহ ক'রে সেদিন যে-যার বাড়ী ফেরা গেল।

পরের দিন বিকেলে হারাণের দোকানে গিয়ে দেখলুম বেশ নিবিষ্ট চিত্তে সে কাজ করছে। একখানা ঘুড়ি কিনে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হারাণ, দাঁত তুলিয়েছ না কি?

হারাণ বললে—দেখ ভাই রাঙা-আলু, কাল সারা-রাত্রি ঘুমুইনি, খালি ভেবেছি। ভেবে দেখলুম যে, দাঁতের ওপরে খুবই অবিচার করা হচ্ছে। আচ্ছা, দাঁতের ব্যথা না হ'য়ে যদি পায়ে যন্ত্রণা হোতো তা হোলে পা-টা কেটে তো আর ফেলে দিতে পারতুম না। আরে, নড়া-দাঁতের ধর্ম্মই হলো কটকট-ঝনঝন করা। মন যদি ওদিকে যায় তো মনের দোষ—মনের দোষে দাঁতকে কেন সাজা দেবো। ঠিক বলছি কি না, বল তুমি?

ঠিক বলছ, বলে তখনকার মতন পালিয়ে বাঁচলুম।

তখনকার দিনে বৌবাজার থেকে আরম্ভ ক'রে সেই গ্রে স্ট্রীট অবধি বড়-রাস্তার ওপরেই অনেকগুলো মদের দোকান ছিল। পথচারীরা এক পোয়া রাস্তা দূর থেকেই নাকে কাপড় দিত আর দোকানের কাছাকাছি এসে দিত কান চাপা। দোকানের ভেতরে সেই সকাল থেকে রাত সাড়ে নটা অবধি অসংখ্য মাতাল তারস্বরে গান, তর্ক, চ্যাচামেচি, ঝগড়া করতে থাকৃত। সরকারী হুকুমে এই সব দোকান এখন বড়-রাস্তার ধারে সরু-সরু গলির মধ্যে উঠে গেছে। এতে তিন পক্ষই হয়েছে খুশী। বড়-রাস্তা থেকে একটা বীভৎস দৃশ্য সরে গেছে। মাতালেরাও বেঁচেছে—ঢুকতে বেরুতে চেনা-লোকের চোখে পড়া, রাস্তায় বেরিয়ে দু-কদম যেতে না যেতেই পুলিশ কনস্টেবল, যারা মালদার মাতাল শীকার করবার জন্যই ওৎ পেতে বসে থাকত, তাদের খপ্পরে পড়া ইত্যাদি হাজার হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পেয়েছে। দোকানদারেরাও খুশী, কারণ তাদের খদ্দের বেড়েছে।

আগেই বলেছি, সেকালে প্রায় সব সময়েই রাস্তার ভদ্রলোক, ছোটলোক সব শ্রেণীরই মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। 'সুরাপানে সাম্য ভাব প্রবল হয়' কথাটা খুবই সত্যি। কারণ সম্প্রদায়গত প্রভেদ থাকলেও ব্যবহারগত প্রভেদ তাদের মধ্যে বিশেষ দেখতে পাওয়া যেত না। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ বা কাল্পনিক শত্রুর উদ্দেশে হাত-পা ছুঁড়ছে, আধ-আধ ভাষায় এড়িয়ে গালাগালি দিচ্ছে। হয়ত দুই প্রাণের বন্ধু একসঙ্গে বসে মদ্যপান ক'রে ফিরছে পথে কি তর্ক হ'তে হ'তে লেগে গেল তুমুল কাণ্ড—বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে রুলের গুঁতো লাগাতে-লাগাতে টেনে নিয়ে যেত থানায়। কেউ বা পথের ওপরেই হাত-পা চিতিয়ে লম্বা—বসন অসংবৃত, সংজ্ঞা নেই।

সামনে-বাড়ীর লোকেরা বালতি-বালতি জল এনে মাথায় ঢালছে—দেখে-দেখে শিউরে উঠতুম আর ভাবতুম, এখন আত্মবিস্মরণকারী অসংযম লোকে মূল্য দিয়ে কেনে কেন ?

হারাণ বল্‌ত—ব্যাটারা যা হজম করতে পারবিনে তা গিলিস্‌ কেন !

এমন যে বুদ্ধিমান, দার্শনিক হারাণচন্দ্র, নেহাৎ বরাতে নেই বলে যে হাইকোর্টের জজ না হ'য়ে চিঠির ফাইল ও ঘুড়ি ম্যানুফ্যাকচার ক'রেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে, সেও মদ্যপান করত—তবে বছরে একবার মাত্র।

একদিন ইস্কুলে যাবার জন্য পথে বেরিয়েই দেখি, হারাণ তার পাশের পরোটাওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সেই দোকানদারকে গাল পাড়ছে। হারাণের এতদবস্থা আর আগে কখনো চোখে পড়েনি। চোখা-চোখা বোলচাল ছাড়লেও ঝগড়া-ফ্যাসাদকে সে অত্যন্ত অপছন্দ করত এবং তা থেকে দূরে থাকবার জন্য আমাদেরও উপদেশ দিত।

আস্তে-আস্তে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে হারাণ ?

'চোপরাও'—বলে সে এমন চেঁচিয়ে ধমক ছাড়লে যে দশ হাত দূরে ছটকে গেলুম। বাপ রে ! ব্যাপার কি !

ইতিমধ্যে আরও গুটিকয়েক পাড়ার ছেলে বই বগলে সেখানে এসে জমা হোলো। হারাণ আমাদের উদ্দেশে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল—ছেলেমানুষ আছ ছেলেমানুষের মতন থাকবে—ইস্কুলে যাচ্ছ সিদে ইস্কুলে চলে যাও সব।

কথাগুলো বলেই হারাণ আবার পরোটাওয়ালাকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করলে।

পরোটাওয়ালা হিন্দুস্থানী হ'লেও বাংলা ভাষা বেশ ভালই বুঝতে

পারত ও বলতে পারত। কিন্তু পাছে সেই ভাল-ভাল অভিধান বহির্ভূত বাক্যগুলি পরোটাওয়ালার বুঝতে কষ্ট হয় সেজন্য হারাণ সেগুলিকে হিন্দীতে তর্জমা ক'রে বলতে লাগল, আর তাই শুনে রাস্তার লোকেরা হো-হো ক'রে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। একাধারে নতুন-ধরণের গালাগালি আর সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষা শোনবার জন্য ক্রমেই ভীড় বাড়তে লাগল।

একটা জিনিস বরাবর দেখেছি যে বাঙালীর পেটে মদ পড়লেই, প্রায় ক্ষেত্রেই সে ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু, ফরাসী ভাষায় বুলি কাটতে শুরু করে—ইংরেজ কিংবা ফরাসী মাতালকে স্প্যানিশ কিংবা তুর্কী ভাষায় কথা বলতে শুনিনি। যা হোক্, হারাণ সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষায়—যা একমাত্র হারাণ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না অথচ সকলেই বুঝতে পারে—পরোটাওয়ালাকে গালাগালি দিয়ে চলল।

পরোটাওয়ালা লোকটা ছিল আকাট ষণ্ডা। আশ-পাশের যত হিন্দুস্থানী দোকানদারদের মুরুব্বী ও ভরসাস্থল ছিল সে। হারাণের মতন দশটাকে সে খালি হাতেই পাট ক'রে দিতে পারত। কিন্তু দেখলুম যে, হারাণের সম্বন্ধে নির্ব্বিকার হ'য়ে সে নিজের কাজ ক'রে চলেছে।

কৌতূহল সম্বরণ করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠল। পরোটাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলা গেল—কি হয়েছে, হারাণ তোমাকে এত গালাগালি দিচ্ছে কেন?

পরোটাওয়ালা তার নির্ব্বিকারত্ব বজায় রেখেই বললে—কি আবার হবে! ব্যাটা সরাব টেনেছে।

কথাটা শুনে মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল—দুঃখের নয়—চমকের। মনে হোলো—এঁ্যা, হারাণও সরাব খায়! ইস্কুলের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে দেখে অমন মজা ছেড়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হোলো।

ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার! পরোটার

দোকানের সামনে খুব ভিড়, তার মধ্যে বই-হাতে ইস্কুল-ফেরৎ ছেলেই বেশী। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখি হারাণ ও পরোটাওয়ালা দু-জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—হারাণের হাতে ঘুড়ির সরু একটা কাঁপ আর পরোটাওয়ালার হাতে সরু মাথা-বাঁকানো লম্বা একটা লোহার শিক, যা দিয়ে তাদের সেই বিপুলগর্ভ উনুনে খোঁচা দেওয়া হ'য়ে থাকে। কিন্তু পরোটাওয়ালার হাতের অস্ত্র হারাণের হাতের অস্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী ভয়াবহ হোলেও হারাণের মুখনিঃসৃত মিনিটে পঞ্চাশটা বোমার আঘাতে সে ব্যক্তি একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে—একেবারে সম্মোহিত অবস্থা।

রাজ্যের লোক সেই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। এক ভদ্রলোক হারাণকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে হা?

হারাণ হুঙ্কার ছেড়ে বললে—কি হয়েছে! কি হয়েছে এই মেড়োকে জিজ্ঞাসা কর।

পরোটাওয়ালা বলতে লাগল—বাবু, লোকটা সরাব খেয়ে আজ সকাল থেকে আমার দোকানের সামনে এই হাঙ্গামা লাগিয়েছে। সারাদিন এই ভিড়, খদ্দের আসতে পারছে না, সকাল থেকে বিক্রি-বাটা আমার বন্ধ হ'য়ে গেছে।

হারাণ তার হাতের অস্ত্র আপ্‌সাতে-আপ্‌সাতে বললে—তোর দোকানে কেউ পা দেবে না, শালা চোর!

পরোটাওয়ালা একবার চোখ পাকিয়ে হারাণের দিকে চেয়ে আবার সেই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললে—দেখচেন!

ভদ্রলোকটি উদাসভাবে বললেন—পুলিশে খবর দাও।

সেদিনে এক চোর-ডাকাত ছাড়া পুলিশকে ভয় করে না এমন বীর লাখে একটা মিলত কিনা সন্দেহ। পুলিশের নাম হওয়া-মাত্র ভিড় পাতলা হ'য়ে গেল। পরোটাওয়ালা গুটি-গুটি তার দোকানে উঠে উনুনের সামনে

গিয়ে বসল। হারাণ কিন্তু তখনো দাঁড়িয়ে—এমন সময় একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—ঐ লাল পাগড়ী—

আর যায় কোথা! হারাণ দৌড়ে, গড়িয়ে, হামাগুড়ি দিতে-দিতে নিজের দোকানে ঢুকে পড়ল।

শোনা গেল, বছর-কয়েক আগে হারাণ একদিন একখানা পরোটা কিনেছিল, তাতে দোকানদার নাকি তরকারী দিয়েছিল কম। সেদিন থেকে হারাণ যতবার মদ্যপান করে ততবারই নাকি সেই একদিন কম তরকারী দেওয়ার জন্য—যে তরকারী পরোটার সঙ্গে স্রেফ দয়া ক'রে দেওয়া হ'য়ে থাকে—হাঙ্গামা করে।

বাড়ীতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসতে না বসতেই হারাণের হুঙ্কার শোনা যেতে লাগল। বাড়ীতে একজন গুরুস্থানীয়া মহিলা বল্লেন—আজ তোমাদের হারাণ মদ খেয়ে সকাল থেকে রাস্তায় এমন হাঙ্গামা লাগিয়েছে যে কান পাতা যাচ্ছে না।

আর একজন বল্লেন—অমন লোকের কাছ থেকে কারুর কোনো জিনিষ কেনা উচিত নয়।

ঘুড়ির মাধ্যমে হারাণের কিছু-কিছু গুণ আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, হচ্ছে বা হবার সম্ভাবনা আছে—এই রকম কিছু মন্তব্য আশা করছিলুম সে তরফ থেকে, কিন্তু সে রকম কিছু না হওয়ায় তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার ছুটলুম হারাণের খেল্ দেখতে।

গিয়ে দেখি যে, হারাণ আবার আসরে নেমেছে। চারিদিকে আগের চাইতে ভীড় বেশী। অবস্থা তার খুবই খারাপ, পা টলমল করছে, কথাবার্তা যা বলছে তা শুনে মনে হচ্ছে যে কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে! কিন্তু সে অসুবিধার জন্য কথা কিছু কম বল্‌ছে না।

শোনা গেল, পুলিশের নামে ভয় পেয়ে দোকানে ঢুকে সে উপরি-উপরি

কয়েক পাত্র টেনে এমন দুঃসাহস সঞ্চয় ক'রে এসেছে যে রণাঙ্গণে ভূপতিত হবার আগে নড়বে বলে মনে হয় না।

হারাণ মদ-দর্পে টলে-টলে পরোটাওয়ালাকে ইংরিজী ও হিন্দীতে মিলিয়ে উচ্চরবে উপদেশ দিচ্ছে, এমন সময় ভীড়ের সামনেই কোথা থেকে একটা ভাড়াটে গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীর ভেতর থেকে জন চারেক ভদ্রবেশধারী যুবক টপ্-টপ্ ক'রে নেমে ভীড় ঠেলে একেবারে হারাণের সামনে এসে দাঁড়াল। এক জন জিজ্ঞাসা করলে—এ কি কেলেঙ্কারী হচ্ছে?

হঠাৎ তাদের আবির্ভাবে হারাণ একেবারে হ-য-ব-র-ল। সে কি একটা বললে বটে, কিন্তু তা বুঝতে পারা গেল না।

এক জন ধমকের সুরে বল্‌লে—চল, বাড়ী চল।

এবার হারাণ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভাবে একবার—যা যা, বলে সে অবস্থায় যতখানি তাড়াতাড়ি সম্ভব দোকানের দিকে দৌড় দিলে। আগন্তুকেরা আর বাক্যব্যয় না ক'রে হারাণকে ধরে একেবারে কোলপাঁজা ক'রে তুলে ফেল্‌লে। হারাণ হাত-পা ছুঁড়ে কি সব বলতে লাগল কিন্তু ততক্ষণে তারা তাকে গাড়ীর মধ্যে পুরে ফেলে গাড়োয়ানকে ইঙ্গিত করতেই গাড়ীখানা ছুটে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিটের মধেই ভীড় একবারে সাফ্। শুনলুম, ওরা হারাণের ছেলে। মদ খেয়ে বাড়াবাড়ি করলে কি ক'রে যে ওরা টের পায় তা কেউ জানে না। প্রতিবারেই হঠাৎ এসে পড়ে আর কথা বলতে না দিয়ে তারা বাপকে ঐ রকম চ্যাংদোলা ক'রে ধরে নিয়ে যায়।

পরদিন ইস্কুল থেকে ফেরবার মুখে দেখলুম, হারাণ লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘাড় হেঁট ক'রে ফাইল তৈরি করছে।

মণি বাবু

আর একজন অদ্ভুত চরিত্রের মাতাল দেখেছিলুম ছেলেবেলায়, তাঁর নাম ছিল মণিবাবু। বিশিষ্ট ভদ্রঘরের ছেলে এবং নিজেও তিনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। লেখা-পড়া বেশ ভালই জানেন বলে শুনতুম। কোন এক সওদাগরী আপিসে মোটা মাইনের চাকরী করতেন। অতি ভালমানুষ, এত ভালমানুষ যে পাড়ার কারুর সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইতেন না।

মণিবাবু মদ্যপান করতেন বটে কিন্তু মদের আনুষঙ্গিক গণ্ডগোল, চেঁচামেচি বা হাঙ্গামার ধারে-কাছে ঘেঁষতেন না। তবে নিজে কোন হাঙ্গামা-হুজ্জৎ না করলেও গ্রহবৈগুণ্যে তাঁকে নিয়ে পাড়ায় হাঙ্গামার অন্ত ছিল না।

প্রতিদিন সকালবেলা নটার সময় মণিবাবু চোগা-চাপকান, তার ওপরে ধপধপে শাদা পাকানো চাদর গলায় জড়িয়ে আপিসে বেরুতেন। এ নিয়মের আর নড়-চড় ছিল না। মণিবাবুকে দেখে পাড়ার চাকুরে বাবুরা সময় ঠিক করতেন। কিন্তু আপিসে যাবার সময় ঠিক থাকলেও আপিস থেকে ফেরবার সময় কিছু ঠিক ছিল না তাঁর। প্রতি রাত্রে ন-টা থেকে দু-টোর মধ্যে তিনি বাড়ী ফিরতেন ভাড়াটে গাড়ী চ'ড়ে, আর প্রতি রাত্রেই না হোক, সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন তাঁর জন্যে রাত দুপুরে লাগ্‌ত হাঙ্গামা।

মণিবাবু ডেকো-হেঁকো লোক ছিলেন না। মদ্যপান করতেন লুকিয়ে, গোণাগুন্তি দু-তিন জন বিশেষ বন্ধু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে নয় এবং শেষ

দিন অবধি তাঁর ধারণা ছিল যে, যাঁদের সঙ্গে তিনি মদ্যপান ক'রে থাকেন, তাঁরা ছাড়া আর কেউ জানে না তাঁর মদ খাওয়ার কথা।

মণিবাবু ছিলেন বিপত্নীক। দু-টি নাবালক ছেলে, তারা দাদামশায়ের মোটা বিষয়ের মালিক—মানুষ হচ্ছিল কাকা-কাকীমাদের হাতে। সংসারে সজ্ঞানে তাঁকে কোন ঝঞ্ঝাটই পোহাতে হোতো না।

আগেই বলেছি, মণিবাবু নিজকৃত হাঙ্গামায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন না। আফিসে যেতেন সকাল নটায় আর বাড়ী ফিরতেন অনেক রাত্রে ভাড়াটে গাড়ী চেপে।

তখনকার দিনে বড় রাস্তাগুলি ছাড়া কলকাতার গলিপথ ন-টা-দশটার মধ্যে একেবারে নিশুতি হ'য়ে যেত। রাত দুপুরে পাড়ায় ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী ঢুকলে আওয়াজের চোটে অর্দ্ধেক লোকের ঘুম ভেঙে যেত। সে সময়ে ভাড়াটে গাড়ী তো দূরের কথা, বাড়ীর গাড়ীর চাকাতেও রবার ব্যবহৃত হোতো না। শহরবাসীদের কর্ণবিবর এখনকার মতন আওয়াজ-সহ হ'য়ে ওঠেনি, তাই সামান্য শব্দেই তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হোতো।

মণিবাবুদের বাড়ীটা ছিল বেশ বড় আর তিনি থাকতেন সেই পেছনকার দিকের একটি ঘরে। কারণ, লোক-জনের চীৎকার, ছেলে-পিলেদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ তিনি সহ্য করতে পারতেন না, নিরিবিলি থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর ঘরে পৌঁছতে হ'লে অনেকগুলি সিঁড়ি, দালান ইত্যাদি পার হ'তে হোতো; কিন্তু প্রতি রাত্রেই এমন সন্তর্পণে তিনি এই বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করতেন যে একটা ঠোকর খাওয়ারও শব্দ পর্যন্ত হোতো না।

যা হোক, এবার মণিবাবুর হাঙ্গামা সুরু হোলো।

মণিবাবু রাত-দুপুরে পাড়া জাগিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ী চড়ে তো বাড়ী এলেন। পাছে পাড়ার কেউ জানতে পারে বা কারুর চোখে প'ড়ে যান এই আশঙ্কায় গাড়ীতে বসেই যতখানি সম্ভব চারদিক চেয়ে অতি সন্তর্পণে

টুপ ক'রে নেমে ভেজান দরজাটি ঠেলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বাড়ীর চাকর বেচারা কাজকর্ম সেরে বাবুর অপেক্ষায় ভেজান দরজার পাশে বসে সজাগ হ'য়ে ঢুলছিল, বাবু বাড়ী ঢুকতেই সে দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে সটান হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

ওদিকে গাড়োয়ান কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভাড়ার জন্য চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিলে। আজকের দিনে বাস, রিক্শ, ট্যাক্সি প্রভৃতি নানা রকম যান-বাহন চালু হওয়ায় ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানদের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মেলায়েম হ'য়ে পড়েছে। তখনকার কালে তাদের কণ্ঠস্বর ছিল ভয়াবহ এবং আদালতে না গিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে জেতবার ক্ষমতা শহরে দু-চারজন গোণাগুন্তি লোক ছাড়া আর কারুর ছিল না।

যা হোক্, গাড়োয়ানের সেই চীৎকারে আশেপাশের বাড়ীর লোক জেগে উঠে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে লাগল—যাদের সে সুযোগ নেই তারা ঘরে বসেই রাগ হজম করতে থাক্‌ল।

এদিকে গাড়োয়ানের চীৎকার ধাপে-ধাপে চড়ছে, ওদিকে মণি বাবুর কোন সাড়া নেই। প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে আরম্ভ করলে – রোজ রোজ তো এ-হাঙ্গামা আর সহ্য হয় না হে! সবাই সই ক'রে পুলিশে একখানা দরখাস্ত না পাঠালে এ তো থামবে না।

ওদিকে গাড়োয়ান ততক্ষণে কোচবাক্স থেকে নেমে পড়ে দমাদ্দম শব্দে দরজা ঠেঙাতে ও মরিয়া হ'য়ে চ্যাঁচাতে লাগল। পাড়ার কেউ-কেউ আপত্তি করায় গাড়োয়ানের সঙ্গে তাদেরও কিছু বচসা হ'য়ে গেল এরি মধ্যে। চাকর বেচারীর ঘুমটি জমতে না জমতে ভেঙে গেল, সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। পাড়ার সবাই বাবুকে না পেয়ে তার ওপরেই তম্বি সুরু ক'রে দিলেন—যা বাবুর কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে এসে গাড়োয়ানকে বিদেয় করে দে।

কিন্তু রাত্রিবেলা চাকরের বাড়ীর মধ্যে ঢোকার উপায় নেই, পথে দু-দু-টো দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে। কি হবে উপায়! শেষকালে ঘণ্টা-দুয়েক গলাবাজীর পর কোনদিন পাড়ার, কোনদিন বা মণিবাবুর বাড়ীর কেউ, কোন দিন বা চাকরেই ভাড়া মিটিয়ে দিত। হিসাব-নিকাশ কি ক'রে হোতো তা জানি না।

পরদিন সকালে ঠিক ন-টার সময় দেখা যেত, মণিবাবু সেজে-গুজে আপিসে চলেছেন। মুখে সেই নৈর্ব্যক্তিক সলজ্জ হাসি আর অন্তরে নিশ্চিত নিশ্চিন্ততা,—তিনি যে মদ্যপান করেন তা কেউ জানে না।

মধ্যে-মধ্যে মণিবাবু গাড়ী থেকে নামতেই পারতেন না অর্থাৎ বেহুঁস হ'য়ে পড়তেন। এই রকম সব সময়ে তিনি বুদ্ধি ক'রে চেনা গাড়ী ভাড়া করতেন। বাড়ীতে পৌঁছে বাবুর অবস্থা দেখে গাড়োয়ানের চক্ষুস্থির! তার চীৎকারে সাত পাড়া জেগে গেল, কিন্তু মণি বাবু আর ওঠে না। উঠবে কি করে! তিনি তখন যেখানে পৌঁচেছেন সেখান থেকে কোন মাতালই সে রাত্রে আর ফিরতে পারে না। গাড়োয়ানের চীৎকারে অস্থির হ'য়ে পাড়ার লোকেরা নেমে এসে ধরাধরি ক'রে তাঁকে গাড়ী থেকে নামাত আর বাড়ীর লোকেরা চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে যেত।

কোন-কোন দিন এই রকম বেহুঁস হবার মতন অবস্থা হ'লে মণিবাবু বুদ্ধি ক'রে দু-এক জন বন্ধু নিয়ে আসতেন। যাঁরা তাঁকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিতে আসতেন, তাঁদের অবস্থা মণিবাবুর চেয়ে কিছু ভাল থাকলেও দেখেছি যে, তাঁদেরও পদদ্বয় ইচ্ছাশক্তির শাসনের অতীতে চলে গিয়েছে। প্রায়ই মণিবাবুকে ধরাধরি ক'রে নামাতে গিয়ে নিজেরাই খেতেন আছাড়।

উঃ, সে সব দিনের কথা মনে হ'লে আজও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

গাড়ীখানা তো মণিবাবুদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বন্ধুরা অনেক কসরৎ প্যাঁচ ক'রে কোনো রকমে তো রাস্তায় নামলেন! তার

পরে সুরু হোল!—এই মোণে, ওঠ—ওঠ রে, বাড়ী এসেছে—মোণে, এই—ছ্যাৎ, এই মোণে, ওঠ না ভাই—এই চল্‌ল প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে!

মোণে ওঠে না, কিন্তু পাড়ার সবাই উঠে পড়ল। ওদিকে দেরী হচ্ছে দেখে গাড়োয়ান ওপর থেকে সুরু করলে—এ বাবু, আর কত দেরী হবে?

বন্ধুদ্বয় লাগালে তারপর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঝগড়া—ওঃ, ব্যাটা একেবারে লাটসাহেব!

গাড়োয়ান বললে—গালাগালি দিও না বাবু, ভাল হবে না।

—কি করবি রে তুই?

মারামারি লাগে আর কি!

গাড়োয়ানের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বন্ধুদের উৎসাহ গেল দ্বিগুণ বেড়ে। তারা আবার প্রাণপণ জোরে চীৎকার সুরু করলে—মোণে, এই মোণে, ওঠ্ রে বাড়ী এসে গিয়েছে।

শেষকালে পাড়ার লোকেরা প্রাণের দায়ে নেবে এসে দরজা খুলিয়ে চ্যাংদোলা করে মণি বাবুকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেত।

একদিন, তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে, ক'দিন থেকে দারুণ গরম পড়েছে, অফিস থেকে খবর এল যে, মণিবাবু সেখানে হঠাৎ খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। মণি বাবু ছিলেন বাড়ীর বড় ছেলে। তাঁর পরের ভাই চাকরী করত কোথায়, আর তুটি ভাই পড়ত কলেজে। এই দুই ভাই খবর পেয়ে তখুনি ছুটল দাদার অপিসে।

সেদিন সন্ধ্যা-রাতেই বেহুঁস হ'য়ে মণি বাবু বাড়ী ফিরলেন ভাইয়েদের সঙ্গে। সকলে ধরাধরি ক'রে তাঁকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে চলল।

তার পর সারা রাত ডাক্তার-বদ্যির আনাগোণায় পাড়া মুখরিত হ'য়ে উঠল কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। শেষ রাত্রের দিকে মণিবাবু

শেষ হয়ে গেলেন। পাড়ার লোকদের ডাকতে হোলো না, তারা যে যার গামছা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রভাত হবার আগেই মণি বাবুর শব বের ক'রে নিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

মদ খেয়ে মণিবাবু জীবনে এক দিনও হাঙ্গামা না করলেও তাঁকে নিয়ে হাঙ্গামার অন্ত ছিল না।

পরদিন, শ্মশান থেকে ফিরে আসবার পর বিকেলবেলা পাড়ার অনেক মুরুব্বী ও মণিবাবুদের আত্মীয়-স্বজন আসতে লাগলেন তাঁর ভাইদের সান্ত্বনা দিতে। সকলেই প্রাণ খুলে মণিবাবুর প্রশংসা করতে লাগল। ভাইয়েরা বল্‌লে—বাবা মারা যাবার পরে আমাদের যে কি হ'তো দাদা না থাকলে, তা কল্পনাই করতে পারি না। কত অন্যায় করেছি, অত্যাচার করেছি, কিন্তু একদিনের জন্য দাদার মুখ গম্ভীর দেখিনি কিংবা কড়া কথা শুনিনি।

ভাইয়েরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—বৌদি মারা যাবার পর কি রকম যে হ'য়ে গেলেন—ইদানীং তো বাড়ীর কেউ কথা না বললে তিনি নিজে থেকে কোন কথাই বলতেন না।

মুরুব্বীরা বল্‌লেন—ছেলেবেলা থেকে মণি আমাদের সঙ্গে কথনো মুখ তুলে কথা কয়নি—পাড়ায় এত হাঙ্গামা হয় কিন্তু কারুর পক্ষে সে কোন দিন কথা বলেনি—আজকালকার ছেলেদের মধ্যে এমন নির্বিরোধী চরিত্র দেখা যায় না।

হ[illegible]র প্রশংসা বোধ হয় তখনি করা যায়, যখন তার দ্বারা হাঙ্গামার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

চৌধুরী মহাশয়

বিশ্বম্ভরবাবু ছিলেন পাড়ার ছেলেদের ঠাকুর্দা। তাঁর নাতি ন্যাংটেশ্বর ছিল আমাদের বন্ধু আর সেই সম্পর্কেই পাড়ার ছোটছেলেরা তাঁকে ঠাকুর্দা বলে ডাকত। বেঁটে-সেঁটে বেশ ষণ্ডা চেহারা, যৌবনে কুস্তি ও জিমন্যাষ্টিক করতেন—বয়স ষাট পেরিয়ে গেলেও শরীরে তখনো অসম্ভব শক্তি ছিল। পাড়ার কোন ছেলেই, এমন কি বড়রা পর্যন্ত তাঁর আঙুল সোজা করতে পারত না। সব সময়েই গায়ের জোরের কথা এবং যৌবনকালে তাঁরা গড়ের মাঠে গিয়ে কি রকম গায়ে পড়ে ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তাদের ঠেঙানি দিতেন, মাসে অন্ততঃ একবার আমাদের কাছে সেই গল্প করতেন। পাড়ার ছোট-বড় সব ছেলেই ছিল তাঁর বন্ধু।

বিশ্বম্ভরবাবুর একমাত্র ছেলে অর্থাৎ আমাদের বন্ধু ন্যাংটার বাবা যৌবনেই মারা গিয়েছিলেন এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে। তখনও বিশ্বম্ভরের মা ছিলেন বেঁচে। মা, স্ত্রী, পুত্রবধূ, এক নাতি ও এক নাতনী এই নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। তখনকার দিনের হিসেবে বিশ্বম্ভর বাবু বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ী, তা ছাড়া নিজেদের প্রকাণ্ড বসত বাড়ী ও তার পেছনে আট-দশ বিঘের বাগান ও তাতে পুষ্করিণী—এই ছিল তাঁর সম্পত্তি। তখনকার দিনে শহরের অনেক বাড়ীর পেছনে বাগান ও পুকুর থাকত। পাড়ার লোকে বলত বুড়ী অর্থাৎ বিশ্বম্ভরের মার হাতে না কি নগদ টাকা আছে অগাধ।

বিশ্বম্ভর চৌধুরী প্রায় ছেলেবেলা থেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে-মাঝে মদ্যপান করতেন, কিন্তু একমাত্র পুত্র অর্থাৎ আমাদের গ্যাংটেশ্বরের বাবা মারা যাওয়ায় সে শোক ভদ্রলোক শাদা চোখে আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাই প্রতিদিন প্রভূত পরিমাণে মদ্যপান সুরু ক'রে দিলেন।

মদ্যপান ক'রে বিশ্বম্ভর যে খুব দুর্দান্ত হ'য়ে পড়তেন, তা নয়। কারুকে মার-ধোর করা কিংবা রাস্তায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকা, এ সব ছিল না বটে কিন্তু চেঁচামেচি হাঁক-ডাক এমন লাগাতেন যে নেহাৎ যারা তাঁকে জানত তারা ছাড়া আর কেউ তাঁর ত্রিসীমানায় এগুতে সাহস করত না।

সনাতন মাতাল-রীতি অনুসারে চৌধুরী-মহাশয়ও সকালে আপিসে বেরুতেন আর বাড়ী ফিরতেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে, এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের ইতিহাস। ছুটির দিন ও রবিবারগুলো বাড়ীর বাইরে বেরুতেন না বটে তবে সাত-পাড়ার লোক টের পেত যে আজ চৌধুরীর ছুটির দিন।

রাত দুপুরে বাড়ী ফিরে কড়া-নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খোলা না পেলে চৌধুরী-মহাশয় বড়ই বেজার হতেন। একটা সরু লম্বা বদ্ধগলির একেবারে শেষসীমায় ছিল তাঁর বাড়ী। পাছে দরজা খুলতে দেরী হয়, সে জন্য বিশ্বম্ভর গলিতে ঢুকেই সেই ডাকাতে গলায় হাঁক ছাড়তে সুরু করতেন—গিন্নি, ও গিন্নি—দরজাটা খোলো—আমি এসেছি—

পাড়ার কচি ছেলে-পুলে ককিয়ে উঠ্‌ল, আফিংখোরদের নেশা চম্‌কে গেল—বিশ্বম্ভর-গিন্নি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

কর্ত্তা বাড়ীতে ঢুকেই পাড়া কাঁপিয়ে গিন্নিকে সম্বোধন করলেন—বুঝেছ গিন্নি, আজ কি হয়েছে জানো?

কাছাকাছি বাড়ীর লোকেরা উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগল—বিশ্বম্ভর আজ কোথায় কি কাণ্ড ক'রে এল শোনবার জন্য। কিন্তু বিশ্বম্ভর-গিন্নির সেদিকে কোনো উৎসাহই নেই। তিনি সাত বছর বয়সে বৌ হ'য়ে এ-বাড়ীতে ঢুকেছেন, শুধু বিশ্বম্ভরকে নয় তাঁদের তিন পুরুষকে তিনি হাড়ে-হাড়ে চেনেন। নেহাৎ শাশুড়ী এখনো বেঁচে তাই তাঁর প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ হ'তে পারে-নি। তিনি বিশ্বম্ভরের কথাগুলো গ্রাহ্যের মধ্যেই না এনে নিরুদ্বেগে দরজা বন্ধ ক'রে বাড়ীর ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। বিশ্বম্ভর দুই হাত প্রসারিত ক'রে তাঁর পথ আটকে চীৎকার করতে লাগল—বুঝেছ গিন্নি, আজ যা হয়েছে—

গিন্নি বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, এখন ওপরে চল দিকিন—

বিশ্বম্ভর হুঙ্কার ছাড়লে—কি বুঝেছ! বল কি বুঝেছ?

বিশ্বম্ভরের হুঙ্কার শুনে নাতি-নাতনীদের ঘুম ভেঙে গেল। রোজ প্রায় শেষরাত্রে ঠাকুরদাদার সঙ্গে খাওয়া তাদের বাধ্যতামূলক! দাদুর সাড়া পেয়ে তারা ছুটে এল। তাদের দেখে বিশ্বম্ভর দ্বিগুণ উৎসাহে সুরু করলেন—জানিস্ ন্যাংটা, আজ কেল্লার পাশ দিয়ে আস্‌চি, এমন সময় চার ব্যাটা গোরা সোল্‌জার—বুঝলি ন্যাংটা ইয়া-ইয়া চেহারা ব্যাটাদের। আরে বাবা, আমাকে দেখাচ্ছিস্ চেহারা! এসেছিল চালাকী করতে—come on fight বলেই এক শালার রগে একটি ঘুষো ঝাড়তেই ব্যাটার চোখটা উপ্‌ড়ে একেবারে রাস্তায় পড়ে যাচ্ছিল, এমন সময় আর এক ব্যাটা টপ ক'রে চোখটা লুপে নিলে আর দু-ব্যাটা সেটাকে চ্যাংদোলা ক'রে ধরে কেল্লার মধ্যে ছুটে পালিয়ে গেল—বুঝলি!

বোঝা-পড়া হ'য়ে যাবার পর ওপরে ওঠে জামা-টামা ছেড়ে তিনি স্নান করতে গেলেন আর তাঁর গিন্নি ও পুত্রবধূ মিলে কাঠের উনুন

জালিয়ে খাবার গরম করতে লাগলেন। স্নান সেরে খেতে বসলে লুচি ভাজা সুরু হবে—ঠাণ্ডা লুচি আবার তাঁর সহ্য হোতো না কি না!

খাবার সময় সবাইকে সঙ্গে বসতে হবে—সে আশী বছরের মাকে পর্যন্ত। মা খেতেন না, তবে গিন্নি ও পুত্রবধূকে খেতেই হবে। প্রতিদিন মাংসের বাটিতে খানিকটা মাংস রেখে উঠে যাবার সময় বলতেন—বৌমা, মাংসটুকু খেয়ে ফেলো।

পুত্রবধূ যে বিধবা, সন্ধ্যের পর চৌধুরী-মশায়ের সে কথাটুকু আর মনে থাকত না।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছে, এমন সময় কুকুরের কেঁউ-কেঁউ কান্নার রবে পাড়া কেঁপে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে চৌধুরী মশায়ের হুঙ্কার উঠল কুকুরের চীৎকার ছাপিয়ে—এই বোই (boy) শেক্ হ্যাণ্ড!

সঙ্গে-সঙ্গে আবার কুকুরের আর্ত্তনাদ ও তৎসহ যথোপযুক্ত তিরস্কারের সুরে চৌধুরীর শাসন ভাষণ—চোপ্ রাও ইডিয়ট—বোই, শেক্ হ্যাণ্ড।

বিশ্বম্ভরের হুঙ্কার-চীৎকার-গান ইত্যাদি প্রায় প্রতি রাত্রেই শুনে শুনে পাড়ার লোকের অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিল। বরঞ্চ রাত দুপুরের এই নিয়মিত শান্তিভঙ্গের ব্যতিক্রম হ'লে লোকে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ত! সাড়ে ন-টার তোপের মতন বিশ্বম্ভরের বাড়ী ফেরাটাও সকলে সময় নির্দেশকরূপে ব্যবহার করত। পাড়ার লোকে বলত—রাত তখন, চৌধুরী বাড়ী ফেরেনি।

কিন্তু একটা বিষয়ে চৌধুরীর প্রশংসা করত সবাই যে, দশ-পনেরো মিনিটের বেশী হাঁক-ডাক সে করে না। কিন্তু সেদিন তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে কুকুর-কণ্ঠ যুক্ত হ'য়ে এমন অশ্রাব্য ধ্বনির সৃষ্টি হোলো যে সাতটা কনশার্ট পার্টি মিলেও তা করতে পারে না।

সে সময়কার লোকদের পরকে সহ্য করবার শক্তি এখনকার

চাইতে ছিল অনেক বেশী। বিশেষ ক'রে প্রতিবেশীর এই শ্রেণীর অত্যাচার সে যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই হোতো। কিন্তু সে রাত্রে একেবারে অসহ্য হওয়ায় কেউ-কেউ প্রাণের দায়ে, কেউ বা কৌতুহলের ঠেলায় ছুটলেন চৌধুরীর বাড়ীতে—যারা গেল না তারা জেগে বসে রইল ব্যাপারটা কি জানবার অপেক্ষায়।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক বাদে লোকেরা চৌধুরী-বাড়ীতে কোলাহলের যে কারণটি জেনে ফিরে এল তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। বিবরণটি এই প্রকার—

বিশ্বম্ভর চৌধুরী সতেরো-আঠারো বছর বয়সে চাকরীতে ঢুকেছিলেন, এখন তাঁর ষাট পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু সমানে চাকরী ক'রে যাচ্ছেন। পনেরো টাকায় ঢুকে এখন তিনি আড়াইশো টাকার ওপর মাইনে পান। নিজের বিয়ে, ছেলের বিয়ে, ছেলের মৃত্যুদিন প্রভৃতি কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ছাড়া তিনি কখনো আপিস কামাই করেন-নি, তার ওপরে কাজের লোক। এই সব কারণে আপিসের কেরাণীকুল ও কর্ত্তৃপক্ষের সকলেই তাঁকে খুবই খাতির করতেন। আগেকার সায়েবরা আর নেই, এখন সব নতুন ছোকরা সায়েবরা মেজাজী হ'লেও চৌধুরী মশায়কে সম্মান করত।

ক'দিন থেকে এক ছোকরা মনিবের শুকনো মুখ দেখে চৌধুরী তাকে বললেন—ক'দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, কি যেন একটা চিন্তায় তুমি কাতর হ'য়ে রয়েছে—যদি কোন দুঃখ পেয়ে থাক তো আমি রয়েছি কি করতে? তোমাদের বাপ-দাদারা আমার কাছে কিছু লুকোতেন না। তাঁরা কাছে নেই কিন্তু আমি তো আছি। আমি দেখা-শুনা করব বলেই তো এই কাঁচা বয়সে তোমাদের পাঠাতে সাহস করেছেন তাঁরা এই বিদেশ-বিভুঁয়ে।

সায়েব চৌধুরীর কথা শুনে হেসে বললে—ধন্যবাদ চৌধুরী, তোমাকে

অশেষ ধন্যবাদ। ও কিছুই না। দিন-দুয়েক আগে আমার একটা কুকুর মারা গেছে। প্রিয় কুকুর মারা গেলে যে কি দুঃখ মনে লাগে তা কুকুরের সখ যার নেই সে বুঝতে পারবে না।

চৌধুরী-মশায় সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন—ওঃ, সে দুঃখের কথা আর বলো না সায়েব। আমার নিজের খুবই কুকুরের সখ কি না—ও আমি জানি। আমার মা এখনো বলে—বিশে, তোর সমস্ত সন্তান-স্নেহ কুকুরগুলোর ওপর পড়ল কি না, তাইতে তোর ছেলেটা বাঁচল না! বাড়ীতে প্রায় পঞ্চাশটি কুকুর—এক-একটি মরে আর একখানা ক'রে বুকের হাড় খসে যায় সায়েব। তা তুমি কিছু দুঃখ কোরো না, আমি তোমায় কুকুর এনে দেবো।

বলা বাহুল্য যে, চৌধুরী মশায়ের পুত্রশোকের কারণ সান্নিপাতিক ব্যাধি, কুকুর-প্রীতি নয়। ইতিপূর্বে কুকুরের সখ তাঁর কোন কালেই হয়নি।

চৌধুরীরও কুকুরের সখ আছে শুনে সায়েব একটু খুশী হ'য়েই বললেন—আরে সে কুকুর তুমি পাবে কোথায়?

চৌধুরী বললে—সায়েব, তুমি তা হ'লে চৌধুরীকে এখন চেননি। আমি তোমায় ঠিক সেই রকম কুকুরই এনে দোব। উপরন্তু আমার কুকুর শেক্ হ্যাণ্ড করবে, দু-পা তুলে দাঁড়াবে, পেছনের পা তুলে পিকক হবে, লাফাবে—দেখে বলবে, হ্যাঁ, চৌধুরী একটা কুকুর দিয়েছে বটে!

সায়েব বললে—আমার বরাত খারাপ। রাশিয়া থেকে এক জোড়া 'বোরজোই' কুকুর আনলুম, তার একটা জাহাজেই মরে গেল আর একটা সেদিন গরমে মরে গেল। এখানে ও কুকুর পাও তো দেখো তো—যত দাম চায় আমি দিতে রাজী আছি।

চৌধুরী বললেন—কুকুর আমি তোমাকে দোবোই, তুমি কিছু ভেবো না। কিন্তু দাম তোমাকে দিতে হবে না।

ব্যস। তারপরে চৌধুরীর আর কিছুই মনে নেই। সায়েবকে দেখলে মধ্যে-মধ্যে মনে হয় বটে, কিন্তু ঘর থেকে বেরুলেই ভুলে যান, এমনি চলেছে, এমন সময় সায়েবই এক দিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললে —চৌধুরী, আশা করি, আমার কুকুরের কথা ভোলনি?

চৌধুরী তখুনি বলে ফেললে—সে কথা কি ভুলতে পারি সায়েব! সেই দিনই বাড়ী গিয়ে আমার যেটা সব চেয়ে ভালো কুকুর, তাকে বললুম—ভোলা, তোর বরাত ভাল রে, আমার সায়েব তোকে চেয়েছে। যা ব্যাটা, তুই যেমন পেটুক তেমনি জায়গায় যা! দু-বেলা চপ-কাটলেট ওড়াবি। ওঃ! আমার কথা শুনে ফুর্ত্তির চোটে ভোলা লাফাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। তারপরে রোজই আপিসে বেরুবার সময় আসতে চায়—শেষকালে পরশু দিন নিয়ে আসব বলে চেনে বেঁধেছি এমন সময় ভোলার মন খারাপ হ'য়ে গেল!

চৌধুরীর কথা শুনে সায়েব হাসবে কি কাঁদবে স্থির করতে পারে না, এমন অবস্থা! তিনি চৌধুরীকে বললেন—বল কি চৌধুরী। তুমি কুকুরের কথা বুঝতে পার?

চৌধুরী সবিনয়ে বললে—শুধু কথা নয় হুজুর—মনের কথা! তা যদি না পারলুম তো এত দিন কুকুর পুষলুম কি করতে? তুমি কিছু ভেবো না হুজুর। আজই আসবার সময় ভোলা আসবার জন্য লাফালাফি সুরু করেছিল। তা আমি তাকে কাল কি পরশু নিয়ে আসব বলে এসেছি।

সায়েবের মুখে দ্বিতীয় বার কুকুরের কথা শুনে চৌধুরী ঠিক ক'রে ফেললেন, আর নয়। বার বার আরব্য উপন্যাস শোনালে সে চটে যেতে পারে। যেমন ক'রেই হোক ভাল কুকুর একটা সংগ্রহ করতেই হবে, এমন সংকল্প সারাদিন ধরে আঁটতে লাগলেন মনের মধ্যে। কোথায় কার কাছে ভাল কুকুর আছে বা সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, তারই

আলোড়ন উঠল মনের মধ্যে—কিছুই পান-না, এমন সময় ভক্তবৎসল দয়া করলেন।

সেদিন রাত দুপুরে বাড়ী ফেরবার মুখে একটা চাটের দোকানের সামনে এক পাল কুকুরকে বসে থাকতে দেখে চৌধুরী মশাই স্থির করলেন, সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা ভাল দেখে ধরে নিয়ে গিয়ে রাতারাতি শিখিয়ে-পড়িয়ে কাল সকালে সায়েবকে উপহার দেবেন। কিন্তু চিন্তাটিকে কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা-জনিত পরিশ্রমের ফলে তাঁর বহু আয়াসলব্ধ লক্ষ টাকার নেশাটি ছুটে গিয়েছিল এবং সে জন্য এই মাগ্যির বাজারে কিঞ্চিৎ ব্যয়-বাহুল্যও ঘটেছে।

ব্যাপার কি জানতে চাওয়ায় চৌধুরী মশায় প্রকাশ করেছেন যে যেটাকেই ধরতে গিয়াছেন, সেটাই মেরেছে দৌড় আর সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও তার পেছনে ধাওয়া করেছেন। মত্ত অবস্থায় কল্পনার সঙ্গে পদযুগলের তালের সমতা রক্ষা করতে না পেরে দু-চার বার আছাড়ও খেতে হয়েছে। এই রকম ক'রে তিন-চারটের পেছনে মাইল খানেক ছুটোছুটি ক'রে শেষকালে কুকুরও ধরা পড়ল না, এদিকে নেশাও গেল ছুটে—আবার কেঁচে গণ্ডুস সুরু ক'রে তবে মাথায় নূতন প্ল্যান এল।

এবারে চৌধুরী মশায় একটা কাটলেট কিনে কুকুরদের দেখানো মাত্রই সবগুলো ছুটে এল, কিন্তু এইটে ছিল তাদের সর্দার—এটা আর সবাইকে তাড়িয়ে নিজে এল অর্থাৎ সমস্ত কাটলেটটি নিজেই খাবে। চৌধুরী মশায় তাকে 'আ তু তু' ক'রে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে কাটলেটের আধখানা খেতে দিলেন। সারমেয়-নন্দন খেতে ব্যস্ত, ইতিমধ্যে বাকী আধখানা কাটলেট নিজের মুখে পুরে দিয়ে কোঁচাটা খুলে কুকুরটার গলায় বেশ ক'রে বেঁধে ফেললেন। তারপরে টানতে-টানতে বাড়ীতে এনে তাকে লাফানো, দু-পায়ে দাঁড়ানো,

শেক্‌ হ্যাণ্ড প্রভৃতি করতে শেখানো হচ্ছিল, এমন সময় পাড়ার লোকেরা গিয়ে উপস্থিত।

পাড়ার লোকেরা এ কথাও বললেন যে, সায়েবী কায়দা-কানুন ও লম্ফ-ঝম্ফগুলো রপ্ত হ'য়ে গেলে শেষরাত্রের দিকে কুকুরটির ল্যাজ ছাঁটাই হবে এবং সেজন্য একটু চেঁচামেচিও হ'তে পারে, এমন একটি সংবাদও বিশ্বম্ভর চৌধুরী নাকি তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

এ-হেন সুখবরটি পেয়ে দু-একজন শঙ্কা প্রকাশ করায় তাঁরা বললেন—ভয় নেই, বিশ্বম্ভরের মায়ের আওয়াজ পাওয়া গেছে—বুড়ীকে দেখলেই ওর সব মাতলামো ছুটে যাবে। ভাল ছেলের মতন গুটি-গুটি এখুনি গিয়ে খেতে বস্‌বে।

সকলে বলাবলি করতে লাগল—বিশ্বম্ভর মাকে বড় ভক্তি করে। যে অবস্থাতেই থাক্‌ না কেন, জীবনে মার কথা সে কখনো অমান্য বা অবহেলা করেনি।

ষাট বছর বয়স হয়েছে, অথচ সে ব্যক্তি কখনো মায়ের কথা অমান্য বা অবহেলা করেনি, এমন লোক আর দেখা তো দূরের কথা—জীবনে দ্বিতীয়বার শুনিনি।

তবুও বিশ্বম্ভর মাতাল ছিল।

যা হোক, সায়েবের বাড়ীতে কুকুর গেল না বটে কিন্তু সে জীবটি বিশ্বম্ভরের বাড়ীতেই রয়ে গেল এবং মৃত্যু অবধি তার ল্যাজের দৈর্ঘ্য অক্ষুণ্ণই ছিল।

নাতনীর বিয়ের মাসখানেক পরেই দিন কতক ভুগে একদিন সকালবেলা বিশ্বম্ভর চৌধুরীর মা মারা গেলেন। ষাট বছর বয়সে চৌধুরী-মহাশয় মাতৃহীন হ'য়ে যে খুব আঘাত পেয়েছেন, তাঁর মুখ দেখে তা মনে হ'লো না, বরং বেশ খুশী হয়েছেন বলেই বোধ হ'লো।

অনেকে বলতে লাগলেন—বুড়ীর হাতে বেশ কিছু নগদ ছিল, এত দিন পরে সেগুলি হাতে আসায় চৌধুরী আর হাসি চাপতে পারছে না।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় শ্মশান-বন্ধুর দল ফিরে এল দু-টো ভাড়াটে গাড়ী ক'রে। দেখলুম, একটা গাড়ী থেকে বিশ্বম্ভরকে প্রায় কোলপাঁজা ক রে নামিয়ে রাস্তার দাঁড় করানো হোলো। সে নিঃশব্দে কাঁদছিল, তারপরে কয়েক-পা টলে-টলে এগিয়ে এসে তাদের গলির মুখটার কাছে দড়াম ক'রে পড়ে গিয়ে চীৎকার করতে লাগল—মা গো, আমায় ফেলে তুই কোথায় গেলি!

চৌধুরীর চীৎকার শুনে পাড়ার ছেলে-বুড়ো বেরিয়ে এল। বৃদ্ধ ও চৌধুরী-মশায়ের সমবয়সীরা মিলে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, কিন্তু কোনো সান্ত্বানাই তাঁর শোকের আবেগ সামলাতে পারলে না। তিনি সেই রাস্তায় লুটিয়ে 'মা মা' ক'রে কাঁদতে থাকলেন। সেই আকাট ষণ্ডা চৌধুরীর অন্তঃকরণের একটা জায়গা এমন দুর্বল দেখে কেউ বা দুঃখ প্রকাশ, কেউ বা ঠাট্টা করতে লাগল বটে, কিন্তু তার সেই কান্না বালকদের হৃদয়ে এক জায়গায় এমন ঘা দিলে যে সমবেনায় তাদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল।

শেষকালে পাড়ার মুরুব্বীরা তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাবার জন্ম ধরাধরি ক'রে দাঁড় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কার সাধ্য তাকে সামালায়! তার এক-একটা ঝট্‌কানিতে সবাই ছিট্‌কে পড়তে লাগল। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের বন্ধু অর্থাৎ চৌধুরী-মশায়ের নাতি ল্যাংটাকে বললেন—যা রে ল্যাংটা, তুই একটু বল্‌গে যা, তুই বল্‌লে ঠিক উঠে যাবে!

সবাই বলাবলি করতে লাগল যে, অপরিসীম মাতৃশোক নিবারণের জন্ম চৌধুরী অপরিমিত মদ্যপান করেছে।

একজন বৃদ্ধ, তিনি চৌধুরী-মশায়ের চাইয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন! ভদ্রলোক তামাক টানতে-টানতে বলতে লাগলেন—একটু বাদে ও আপনিই উঠে যাবে'খন—সারা জীবনটা কাটল ওর কেলেঙ্কারী দেখতে-দেখতে—

যা হোক, চৌধুরী ওঠেই না, কেউ সামলাতেও পারে না, এমন সময় ন্যাংটা কাছে গিয়ে বললে—দাদু, চল ভেতরে, ওরা সব কান্নাকাটি করছে।

ন্যাংটার কথাগুলো চৌধুরী-মশায়ের মাতৃশোকাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করলে। তিনি দ্বিগুণ জোরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—ওরে ন্যাংটা রে, ওরা কি বুঝবে রে শালা! তোর মা একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল; তোর তখন চার বছর বয়েস—আমার মা বিধবা হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে, আমার বয়সে তখন তিন মাস! তো শালার বাপ গেলেও ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা পর্য্যন্ত বেঁচে ছিল -আমার এই দুনিয়ায় এক মা ছাড়া আর কোন শালাই ছিল না রে। সেই মা আমার চলে গছে—আমার দুঃখ তুই শালা কি বুঝবি!

এদিকে ঠাকুর্দার ওই রকম হ্যানস্তা হচ্ছে দেখে বন্ধু ন্যাংটেশ্বর নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ছেলে-বুড়ো সবাই একযোগে মিলে চৌধুরী-মশায়কে তুলে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল।

পাড়ার মুরুব্বীরা চৌধুরীর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে মায়ের শোক তিন দিনের, মাঝে থেকে তার মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে যাবে।

গণকের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কতক মেলে, কতক মেলে না, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হোলো না। মদ্যপান বেড়ে গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃশোকও বেড়েই চলল।

মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি হ'য়ে যাবার পর চৌধুরী-মশায় আর আপিসে বেরুলেন না। সেখান থেকে সায়েবরা ডেকে পাঠাতে লাগল, লোক-জন যাওয়া-আসা করতে লাগল, কিন্তু চৌধুরী তাদের বলে দিলেন—আমার যখন সতেরো- আঠারো বছর বয়েস, তখন মা একদিন বলেছিল, ওরে বিশে, একটা কাজ-কর্ম্মে মন না দিলে বয়ে যাবি। শেষকালে আমায় কি পথে বসাবি! এই বেলা একটা চাকরী-বাকরী দেখে ঢুকে পড়। মার কথায় তখন সেই পনেরো টাকা মাইনেতে চাকরীতে ঢুকেছিলুম। না হ'লে, চাকরী করবার মতন অবস্থা আমার নয়! আজ ও নয়, সেদিনও ছিল না। মা চলে গেছে, আবার চাকরী কিসের।

চৌধুরী বাড়ীতে বসে দিন রাত তেড়ে মদ্যপান সুরু ক'রে দিলে। বাড়াবাড়ি দেখে ন্যাংটার ঠাকুরমা অর্থাৎ চৌধুরী-মশায়ের স্ত্রী এক দিন বললেন—ওগো, একবার আমার মুখের দিকে চাও!

সেইদিনই চৌধুরী-মশায় উকীল, সাক্ষী প্রভৃতি ডেকে এনে উইলের বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন।

কিছু দিনের মধ্যেই অর্থাৎ মায়ের বাৎসরিক হবার আগেই চৌধুরী মশায়েব শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল।

নেলো

আর একটি মাতালের কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

আমাদের ছেলেবেলায় বড় রাস্তায় অর্থাৎ হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে আরম্ভ ক'রে মানিকতলার মোড় অবধি অসংখ্য খোলার বাড়ী, ছিল। এই সব বাড়ীর অনেকগুলিতেই ছিল হোটেল। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, চচ্চড়ির নয়, এখানে চপ, কাটলেট, কারি, কোর্মা ও আরও সব অদ্ভুত নামের মাংসের খাবার তৈরী হোতো। বড় লোকেরা অর্থাৎ যাঁদের পয়সা, সখ ও সাহস এই তিনই ছিল, তাঁরা মধ্যে-মধ্যে খানা খেতে যেতেন বিলিতি হোটেলে, আর যাঁদের পয়সা ইত্যাদির অভাব সত্ত্বেও ছিল রসের প্রাণ, তাঁরা মধ্যে-মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকতেন এই সব হোটলে। সে যুগে এ সব হোটেলে খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ না হ'লেও নিন্দনীয় ছিল। তার কারণ এইগুলির মধ্যে নিষিদ্ধ পানীয় ও ভোজ্য চলত অবাধে।

আমাদের বাড়ীর পাশেই এই রকম একটা বড় হোটেল ছিল। এই হোটলের মালিক ছিল স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী। এই রকম হোটেল প্রতিষ্ঠা ক'রে জন সেবার পন্থা সে-ই নাকি প্রথম উদ্ভাবন করেছিল।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে এই গিরিশের দোকানের সামনে খুব ভিড় হয়েছে দেখে নীচে গিয়ে দেখলুম, দোকানের সাম্‌নের রকে একটা মাতাল এসে বসেছে। তার গায়ে কোনো জামা নেই, পরনের ধুতিখানা কোনো রকমে কোমরে জড়ানো—খুব মজার মজার কথা. বলছে আর

লোকেরা হো-হো ক'রে হাস্‌ছে। ভিড়শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই তার ভাব। প্রায় সকলেই তাকে কোন-না-কোনো প্রশ্ন করছে আর সকলকেই সে একটা-না-একটা জবাব দিচ্ছে এবং প্রত্যেক জবাবটাই হাসির ফোয়ারা!

চমক লাগল! ঠিক এ ধরণের মাতাল ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। মাতাল দেখে-দেখে তাদের সম্বন্ধে একটা আন্দাজ মনের মধ্যে তৈরি হ'য়ে গিয়েছিল। একে দেখে মনে হ'ল—এ ব্যক্তি আমার সেই আন্দাজের গণ্ডীর বাইরের লোক।

গোলমাল, হাসি, হয়্‌রা ও ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে দেখে হোটেলের মালিক চক্রবর্তী মশায় শঙ্কিত হ'য়ে বলে ফেললেন—ওরে নেলো, এখন যা তাই। সন্ধ্যের সময় দোকানের সামনে ভিড় দেখলে খদ্দের ভড়কে যাবে।

নেলো বললে—যাচ্ছি ঠাকুর যাচ্ছি। আচ্ছা একটা কথার উত্তর দাও দিকিন—সুড়-সুড় করে চলে যাচ্ছি। লোক বলে তোমার জ্ঞানগম্যি আছে। আচ্ছা বল তো বাবা, গাছ আগে কি বীচি আগে? মুরগী আগে না ডিম আগে?

প্রশ্ন শুনেই ভীড়ের সবাই হেসে উঠল। কেউ বললে—গাছ আগে, কেউ বললে—বীচি আগে। কিন্তু সমস্তটার সমাধান কেউ করতে পারলে না।

ভীড় বাড়তেই লাগল। দেখলুম, সকলেই তাকে চেনে, ছেলে-বুড়ো সবাই তার নাম ধরে ডাকে, সবাই তার সঙ্গে কথা কয় আর সবার কথারই সে জবাব দেয় এমন মজা ক'রে যে, না হেসে থাকতে পারা যায় না। প্রথম দর্শনেই মনে হোলো, যাই হোক না কেন লোকটার বুদ্ধি আছে, এ কথা মানতেই হবে।

আরও কিছুক্ষণ এই ভাবে হাসি-তামাসায় কাটবার পর চক্রবর্তী ঠাকুর বললেন—নেলো, এইবার যা তাই, সন্ধ্যে হোল, এখন যা। তোর

তো আজ সারারাত চল্‌বে—রাত্রি' দশটা নাগাদ যদি মনে থাকে তো আসিস্, এইখানেই খাবি।

নেলো বললে—যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, দুটো চপ দাও খেয়ে চলে যাই।

—আবার এখন চপ কেন? বললুম না, রাতে যত চাইবি দেবো।

নেলো বললে—এই তো বাবা বেতালা বাজালে। পেটের মধ্যে ক্ষিদের খেয়াল'তান ছাড়ছে হ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ত্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—তার সঙ্গে সমানে সঙ্গত চালাবে, তা নয় তুমি ঢিমের ঠেকা সুরু করলে? কোথায় এখন বেলা পাঁচটা আর কোথায় রাত্তির দশটা—কোন পাঁদাড়ে পড়ে থাকব তখন, তা মা ধ্যান্তেশ্বরীই জানেন। দুটো চপ দাও, ভাল ছেলের মতন খেতে-খেতে চলে যাই।

লোক-জন তার কথা শুনে হাসতে লাগল বটে, কিন্তু ঠাকুর মশায় গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রেই রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে নেলো বললে—আচ্ছা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, যদি ঠিক উত্তর দিতে পার তো আমি চলে যাব আর যদি না পার তো চারটে চপ খাওয়াতে হবে।

ভীড়ের লোকেরা নেলোর প্রশ্নটা শোনবার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি প্রশ্ন নেলো?

কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই ঘাড় পাতে না। শেষকালে সবাই চাঁদা করে দু-আনা তুলে ফেললে—তখনকার দিনে এই সব দোকানে ছোট চপের দাম ছিল দু-পয়সা মাত্র।

নেলো প্রশ্ন করলে—ভগবান আমার কোচুয়ান—কেন বল তো বাপু?

কেউ জবাব দিতে পারে না, সবাই চুপ।

নেলো বললে—কারণ, তিনি আমায় যে পথে চালান আমি সেই পথেই চলতে বাধ্য হই।

ভীড়ের লোকেরা হো-হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। তখুনি চারটে চপ হাজির হোলো। নেলো গপ্‌ গপ্‌ ক'রে খেতে লাগল আর লোকেরা ওরি মধ্যে কিছু আমোদ পাবার আশায় হাঁ ক'রে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল।

Oxford University Misson বাড়ীটার সদর দরজা আজ-কাল বিবেকানন্দ রোডের ওপর হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় ও রাস্তাটার অস্তিত্বই ছিল না—ও বাড়ীটার সদর দরজা ছিল কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীটের ওপরেই, আর ঠিক সামনে বিপরীত ফুটপাতেই ছিল এক মদের দোকান—ঈশ্বরের পাশে শয়তানের বাসা প্রবাদটির জ্বলন্ত নিদর্শনের মতন।

এক দিন বিকেল বেলা, বোধহয় ইস্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার মুখে দেখি এই মদের দোকানের সামনে বিপুল জনতা—এত ভীড় যে ট্রাম চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে। ভীড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে যা দেখলুম তা কল্পনাতীত। সে দৃশ্য শহরের রাস্তায় কল্পকালে একবার দেখা যায় কি না সন্দেহ!

দেখলুম, মদের দোকানের সামনের চওড়া রোয়াকের ওপরে একটা বিরাট কুমীর পড়ে আছে, অবশ্য মৃত। তার মুখখানা হাঁ করিয়ে তার মধ্যে দু-টো এগারো ইঞ্চি থান ইঁট ভরা হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ার কায়দায় নেলো তার পিটে চড়ে বসে আছে। তার দু-পাশে ছোট, বড়, ছুঁচ-মুখো, থ্যাবড়া-মুখো সব মাংস-কাটার ছুরি-ছোরা পড়ে রয়েছে। একটা ছোরা হাতে নিয়ে নেলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলতে লাগল—এত দিন ধরে কত মানুষ খেয়েছে তার ঠিক নেই, আজ ব্যাটা ধরা পড়েছে। এর মাংস দিয়ে চপ, কাটলেট, কোপ্তা, কোর্মা বানাব—আপনাদের নেমন্তন্ন রইল।

নেলোর আসল নাম ছিল লালবিহারী সাহা। সে গালার কাজ করত

এবং বেশ দু-পয়সা রোজগার করত। মাঝে-মাঝে দেখা যেত ধোপদোস্ত ধুতি, জামা, চাদর ও পায়ে জুতো পরা লালবিহারী বাবু ঘাড় গুঁজে হন্-হন্ ক'রে পথ দিয়ে চলেছে। সে সময় অনেককে শুনেছি তাকে সম্ভাষণ করতে—এই যে লালবিহারী বাবু, কত দূর চলেছেন?

লালবিহারী ঘাড় তুলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিত—এই যাব একটু রাধাবাজারে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, 'লালবিহারী বাবু' মূর্ত্তিতে তাকে মোটেই মানাত না। তার চেয়ে সেই আধ-ময়লা ধুতি—আধখানা কোন রকমে কোমরে জড়ানো আর আধখানা রাস্তায় লুটোচ্ছে, এক পা এখানে পড়েছে আর এক পা ওখানে—সেই অবস্থাটাই যেন তাকে মানাত ভাল। তার কারণ, ঐ অবস্থায় না পৌঁছলে তার মুখ দিয়ে তত্ত্বকথা বেরুত না—যে জন্য তার এত জনপ্রিয়তা। নইলে সংসারে মাতালের অভাব কি?

রাস্তায় এমন বেলেল্লাগিরি করা সত্ত্বেও তাকে পুলিশ ধরত না কেন—এটা আমাদের কাছে একটা সমস্যা ছিল। শুনেছিলুম, কলকাতার একজন নামজাদা 'বাবু' মদ খেয়ে রাস্তায়-রাস্তায় বেলেল্লাগিরি ক'রে বেড়াবার জন্য নেলোকে পুলিশের লাইসেন্স ক'রে দিয়েছে। এমন সব দিলদরিয়া মাতাল-বৎসল 'বাবু' বাস্তব জগতে বাস না করলেও সেদিন পর্য্যন্তও তাঁরা লোকের কল্পনা জগৎ থেকে নির্বাসিত হননি।

সে সময় কায়স্থদের পৈতে গ্রহণ নিয়ে শহরে খুব হৈ-চৈ সুরু হয়েছিল। অনেক ধনী ও পণ্ডিত কায়স্থ পৈতে নিতে লাগলেন এবং শাস্ত্র পেড়ে প্রমাণ করতে লাগলেন যে তাঁরা ক্ষত্রিয়। কেউ-কেউ নিজের পদবীর পরে 'বর্মা' শব্দটি যোগ করলেন—শহরে খুব হৈ-চৈ, ব্রাহ্মণেরা একেবারে তটস্থ।

এই সময় এক দিন দেখি, অক্সফোর্ড মিশনের সামনে মদের দোকানের রকে একটা একতালা সমান উঁচু ও সেই অনুপাতে মোটা পিঁপের ওপর দাঁড়িয়ে নেলো বক্তৃতা সুরু করেছে—ফুটপাতের ওপরে বেশ ভীড়।

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক, সামাজিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় অবনতি ও সে বিষয়ে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে বলে চলেছে। বিষয়বস্তু দুরূহ ও গম্ভীর হলেও তার ভাষার প্রসাদগুণে ইস্কুলের ছেলে থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজের অধ্যাপক পর্যন্ত সকলেই সেই বক্তৃতা উপভোগ করছে।

বেশ চলছিল, হঠাৎ নেলো বক্তৃতা থামিয়ে সেই উচ্চ মঞ্চ থেকে নামবার চেষ্টা করতে সুরু করলে। পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে কয়েক জন 'ধর ধর' বলে উঠল, কেউ বা সত্যি তাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হ'লো কিন্তু তারা পৌঁছবার আগেই নেলো সেই পিপের মসৃণ গা বেয়ে দড়াম ক'রে নীচে পড়েই একেবারে গড়াতে-গড়াতে ভীড়ের কাছে এসে উপস্থিত হ'লো। ভীড়ের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে এতক্ষণ তার বক্তৃতা উপভোগ করছিলেন। ভদ্রলোকের খালি পা, গায়ে নামাবলী, নেড়া মাথায় মোটা টিকি, এক হাতে একটা পোঁটলা—বোধ হয় যজমানের বাড়ী থেকে ফিরছিলেন। নেলো কোন রকমে ভূমিশয্যা ছেড়ে টলমল করতে-করতে ব্রাহ্মণের সামনে এসে অতি বিনীতভাবে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—ঠাকুর মশায়, প্রণাম হই। বড় সুসময়ে এসেছেন আপনি, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল।

ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি পরামর্শ লালু?

—আজ্ঞে, বলছিলুম কি—দেশে এই রকম অনাচার বাড়তেই চল্‌ল, হিন্দুধর্ম তো আর টঁ্যাকে না। আপনারা একটু নেক-নজর না দিলে তো সব যায়!

ঠাকুর মশায় বল্‌লেন—ঘোর কলি, কলিকালে এ সব তো হবেই।

নেলো বল্‌লে—কায়স্থরা পৈতে নিতে আরম্ভ করেছে জানেন কি? দু-দিন বাদে অন্য জাতেও পৈতে নেবে, দেখে নেবেন আপনি।

ঠাকুর বক্র হেসে বল্‌লেন—হ্যাঁ জানি। ওরা সব ক্ষত্রিয় হয়েছে।

—তা দেশে ক্ষত্রিয়ের দল এত বাড়তে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? এর একটা বিহিত করতে পারা যায় না কি?

ঠাকুর মশায় তাঁর পোঁটলাটা দুলিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বল্‌লেন—কি আর করা যাবে, এ যুগে ব্রাহ্মণের কথা কি আর কেউ শোনে?

নেলো টলতে-টলতে দু-হাত প্রসারিত ক'রে তাঁর পথ আটকে বল্‌লে—শোনে বই কি, তেমন বামুন হ'লে শুনতেই হবে। আমি বলি, একটা কাজ করলে হয় না?

—কি কাজ?

—ক্ষত্রিয়দের ঠাণ্ডা করা আপনাদের মতন চাল-কলা-খেকো বামুনের কম্ম নয়। বলছিলুম কি, পরশুরাম ঠাকুরকে একবার খবর দিলে হয় না? আর একবার এই ভারতভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে দিয়ে যেতেন।

ঠাকুর মশায় আর বাক্যব্যয় না ক'রে বাড়ীমুখো ছুটলেন।

সে সময় কায়স্থদের পৈতে নেওয়ার হুজুগে একজন বেশ নাম করেছিলেন। ইনি রোজ সকালে গঙ্গস্নান ক'রে রেশমের কাপড় পরে বেদপাঠ করতেন। তাঁর সেই বেদপাঠ রাস্তা থেকে শুধু যে শোনা যেত তা নয়, তাঁকে দেখতেও পাওয়া যেত। একদিন সকাল বেলা ভদ্রলোক বেদপাঠ শুরু করেছেন, এমন সময় কোথা থেকে নেলো এসে হাজির! তার হাতে একটা খাঁচা আর তার মধ্যে বিরাট আকারের এক মোরগ, সঙ্গে বেশ একটি জনতা, তার মধ্যে বালকের সংখ্যাই বেশী। খাঁচাটাকে মুখের সামনে ধরে নেলো সুর ক'রে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলে—পড় বেটা রাধাকৃষ্ণশ্যাম—

ছেলের দল হো-হো ক'রে উঠতেই ভদ্রলোকের বেদপাঠ মাথায় উঠে গেল। মুখ তুলে ব্যাপার দেখে এগিয়ে এসে তিনি নেলোকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হচ্ছে লালু?

—আজ্ঞে, পাখীটাকে রাধাকেষ্ট পড়াচ্ছি।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—মুরগীতে কখনো রাধাকেষ্ট পড়ে?

নেলোও হেসে বললে—কেন পড়বে না মশায়! আপনার দ্বারা যদি বেদ উচ্চারণ হ'তে পারে তো আমার মুরগী কেন রাধাকেষ্ট বলতে পারবে না?

আর কথা না বাড়িয়ে তিনি জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

এই রকম প্রায় দেড় যুগ ধরে ঘরের পয়সায় মদ খেয়ে নেলো মাতাল রাস্তার লোকদের আমোদের খোরাক জুটিয়ে চলছিল—কখনও পায়ে হেঁটে, কখনো মুটের মাথায়, কখনও গাড়ীর চালে—হঠাৎ এক দিন সে চারপায়ায় চড়ে চলে গেল—unmourned, unattended and unsung.

সমাপ্ত